শ্রীমদ্ভাগবত

একাদশ স্কন্ধ

"সাধারণ ইতিহাস"

(প্রথম ভাগ—অধ্যায় ১-১২)

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য-এর

শিষ্যবৃন্দ কর্তৃক

মূল সংস্কৃত শ্লোক, শব্দার্থ, অনুবাদ এবং বিশদ তাৎপর্য সহ
ইংরেজী SRIMAD BHAGAVATAM গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট

শ্রীমায়াপুর, কলকাতা, মুম্বাই, নিউইয়র্ক, লস্ এঞ্জেলেস, লন্ডন, সিডনি, প্যারিস, রোম, হংকং

ptpdas. mayapur

প্রথম অধ্যায়

যদুবংশের প্রতি অভিশাপ

একটি মুষল উৎপত্তির ফলে যদুবংশের ধ্বংস হওয়ার সূচনা সম্পর্কে এই অধ্যায়টিতে বর্ণনা করা হয়েছে। এই কাহিনীর বিবরণ অনুশীলন করলে জড়জাগতিক সংসার বন্ধন থেকে অনাসক্ত হওয়ার বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দক্ষতার সঙ্গে কুরু-পাণ্ডবদের মধ্যে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ সম্পন্ন করেছিলেন এবং তার ফলে অনেকাংশেই পৃথিবীর ভার লাঘব করেছিলেন। কিন্তু অচিন্তনীয় প্রভাবময় পরমেশ্বর ভগবান নিশ্চিন্ত হতে পারেননি, কারণ অপরাজেয় যদুবংশ তখনও বিদ্যমান ছিল। শ্রীভগবান যদুবংশের ধ্বংস সাধনের অভিলাষ করেছিলেন, যাতে পৃথিবীতে তাঁর লীলাবিলাস সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন করে তিনি নিজধামে ফিরে যেতে পারেন। তাই ব্রাহ্মণদের অভিশাপের ছলনা করে তিনি পৃথিবীর বুক থেকে তাঁর সমগ্র যদুবংশ লোপ করে দিয়েছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায়, দ্বারকা নগরীর কাছে পিণ্ডারক নামে পুণ্যতীর্থস্থানে নারদমুনি এবং বিশ্বামিত্র প্রমুখ বহু মহান্ মুনি-ঋষিরা সমবেত হয়েছিলেন। সেখানে যদু পরিবারের ছেলেরাও খেলা করতে করতে উপস্থিত হয়। এই ছেলেগুলি সাম্বকে একজন গর্ভবতী আসন্নপ্রসবা মহিলার মতো সাজিয়ে নিয়ে এসে মুনি-ঋষিদের কাছে জানতে চাইল সাম্বের ঐ ধরনের গর্ভধারণের ফলাফল কেমন হবে। ছেলেগুলির তামাসার ফলে বিরক্ত হয়ে মুনিরা অভিশাপ দিয়ে বলেন, "ইনি একটি মুষল প্রসব করবেন এবং তাই দিয়েই তোমাদের বংশ ধ্বংস হয়ে যাবে।"

এই অভিশাপে ভয় পেয়ে যদুবংশের বালকেরা তৎক্ষণাৎ সাম্বের উদর থেকে বস্ত্র সরিয়ে একটা লোহার মুষল দেখতে পেল। তাড়াতাড়ি যদুরাজ উগ্রসেনের সভায় গিয়ে সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিল। ব্রাহ্মণদের অভিশাপে আতঙ্কিত হয়ে, যদুরাজ উগ্রসেন সেই মুষলটিকে চূর্ণবিচূর্ণ করে সমুদ্রে ফেলে দিতে আদেশ দিলেন।

সমুদ্রের মধ্যে একটি মাছ সেই লৌহচূর্ণের শেষ অংশটি খেয়ে ফেলেছিল, আর বাকি সব লৌহচূর্ণ ঢেউতে ভেসে তীরে উঠে আসে এবং সেখানে জমা হয়ে তা থেকে নলখাগড়ার বন সৃষ্টি হল।

সেই মাছটিকে ধীবরেরা যখন ধরল, তখন জরা নামে একজন ব্যাধ মাছটির পেট থেকে সেই লোহার টুকরোগুলি নিয়ে তাই দিয়ে একটা তীর বানিয়েছিল। যদিও অন্তর্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত ব্যাপার বুঝতে পারলেন, কিন্তু তিনি এর কোনও প্রতিকারের ইচ্ছা প্রকাশ করেননি। বরং মহাকাল স্বরূপ তিনি এই সমস্ত ঘটনাবলী অনুমোদন করেছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

কৃত্বা দৈত্যবধং কৃষ্ণঃ সরামো যদুভির্বৃতঃ ।
ভুবোঽবতারয়দ্ভারং জবিষ্ঠং জনয়ন্ কলিম্ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **কৃত্বা**—সম্পন্ন করে; **দৈত্য**—দৈত্যদের; **বধম্**—বধ করে; **কৃষ্ণঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **সরামঃ**—শ্রীবলরামকে নিয়ে; **যদুভিঃ**—যদুরা; **বৃতঃ**—পরিবৃত হয়ে; **ভুবঃ**—পৃথিবীর; **অবতারয়ৎ**—ভার হরণের; **ভারম্**—ভার; **জবিষ্ঠম্**—অকস্মাৎ হিংস্রতার সৃষ্টির ফলে; **জনয়ন্**—সৃষ্টি হয়ে; **কলিম্**—কলহের পরিস্থিতি।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—যাদবগণ পরিবৃত হয়ে, শ্রীবলরামের সহযোগিতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বহু দৈত্য বধ করেছিলেন। তারপরে, পৃথিবীর ভার আরও লাঘবের উদ্দেশ্যে, কুরু ও পাণ্ডবদের মধ্যে অকস্মাৎ যে প্রবল হিংস্র কলহের উৎপত্তি ঘটে, তা থেকে শ্রীভগবান কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের আয়োজন করেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে সকল লীলা বিস্তার করেছিলেন, সেই সূত্রেই একাদশ স্কন্ধটি শুরু হয়েছে। দশম স্কন্ধের প্রারম্ভে বর্ণনা করা হয়েছে যে, দানব প্রকৃতির শাসকবর্গের উৎপীড়নে যখন পৃথিবী ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল, তখন মূর্তিমতী ভূমিদেবী অশ্রুসজল নয়নে ব্রহ্মার কাছে গিয়ে পরিত্রাণ ভিক্ষা করেন, এবং ব্রহ্মা তৎক্ষণাৎ দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুরূপী পরমেশ্বর ভগবানের কাছে যান। সেই ক্ষীর সমুদ্রের তীরে দেবতারা যখন বিনীতভাবে প্রতীক্ষা করছিলেন, তখন ব্রহ্মার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান ঘোষণা করেন যে, তিনি অচিরেই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন এবং তাঁর অপ্রাকৃত লীলাবিলাসে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে দেবতারাও অবতীর্ণ হবেন। এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের সূচনা থেকেই প্রতীয়মান হয়েছিল যে, অসুরদের বিনাশ করবার জন্যই তিনি পৃথিবীতে অবতরণ করবেন।

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ *ভগবদ্গীতা* (১৬/৬)-র তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাই লিখেছেন যে, দিব্য শাস্ত্রাদির অনুশাসনগুলি যাঁরা মেনে চলেন, তাঁদেরই দেবতা বলা হয়ে থাকে, তেমনি যারা বৈদিক শাস্ত্রাদির নির্দেশ অমান্য করে চলে, তারা অসুর কিংবা দানব রূপেই পরিচিত হয়। জড়জাগতিক প্রকৃতির ত্রিগুণ-দোষে আবদ্ধ হয়ে থাকার ফলে যারা জন্ম এবং মৃত্যুর অবিরাম চক্রে আবর্তিত হতে থাকে,

সেই সমস্ত বদ্ধ জীবদের পথপ্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বৈদিক শাস্ত্রসম্ভার এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে উপস্থাপিত হয়েছে।

বৈদিক অনুশাসনগুলি কঠোরভাবে মেনে চললে, আমাদের জড়জাগতিক আকাঙ্ক্ষাগুলি অনায়াসেই তৃপ্ত করতে পারি, এবং একই সাথে ভগবদ্ধামে আমাদের নিজ নিকেতনে ফিরে যাওয়ার পথে যথার্থ অগ্রসর হতেও পারি। এইভাবেই শুধুমাত্র *ভগবদ্গীতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* মতো বৈদিক শাস্ত্রাদির মাধ্যমে উপস্থাপিত পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশাবলী পালন করার ফলেই ভগবানের নিজধামে আমরা সৎ, চিৎ এবং আনন্দময় জীবন লাভ করতে পারি।

দানবেরা অবশ্য পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর উপদেশামৃতের অবিসম্বাদিত প্রামাণিকতা নিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে, এমন কি পরিহাস করেও থাকে। যেহেতু এই সমস্ত অসুর-প্রকৃতির বদ্ধ জীবেরা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের রাজকীয় মর্যাদায় ঈর্ষাপরায়ণ, তাই শ্রীভগবানের নিঃশ্বাস থেকে প্রত্যক্ষভাবে উৎসারিত এই সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারের উপযোগিতা তারা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতেই চায়। অসুরেরা তাদের কল্পিত খেয়ালে পরিচালিত সমাজ পত্তন করে এবং যে সমস্ত ধর্মপ্রাণ জীব নিষ্ঠাভরে ভগবানের ইচ্ছা অনুসরণ করে চলতে চায়, বিশেষ করে তাদের জীবনে অনিবার্যভাবেই বহু প্রকার বিপর্যয় এবং দুঃখ-দুর্দশার সৃষ্টি করে এমন সমাজই গড়ে তোলে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* বলেছেন যে, ঐ ধরনের বিপর্যয় যখনই প্রাধান্য লাভ করে, পৃথিবীতে ধর্মবিবর্জিত সমাজের প্রাদুর্ভাব ঘটে, তখন সেই বিষম অবস্থায় ভারসাম্য রক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি স্বয়ং অবতরণ করে থাকেন। তাই, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দিব্য শৈশবকালের শুরু থেকেই যে সমস্ত দুর্দান্ত অসুর তথা দানবেরা পৃথিবীর বুকে ভার হয়েছিল, তাদের একে একে সুচারুভাবে নিধন করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভ্রাতা শ্রীবলরাম, তিনিও পরম পুরুষোত্তম ভগবান, শ্রীকৃষ্ণকে সহযোগিতা করেন। শ্রীভগবান একজন হলেও, এক মুহূর্তে তিনি নিজেকে নানা রূপে বিস্তারিত করতে পারেন। সেটাই তাঁর সর্বশক্তিমত্তা। আর তাঁর প্রথম প্রকাশ হলেন শ্রীবলরাম অর্থাৎ শ্রীবলদেব। ধেনুকাসুর, দ্বিবিধ এবং ঈর্ষাকাতর রুক্মী সহ বহু কুখ্যাত অসুরকে শ্রীবলরাম বধ করেছিলেন। যদুবংশের অনেকেই শ্রীকৃষ্ণের সহযোগী হয়েছিলেন, তাঁরা শ্রীভগবানেরই অধীনে বিভিন্ন দেবতাদের অবতাররূপে ধরাধামে এসেছিলেন।

অবশ্য শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর অভিব্যক্ত করেছেন যে, শ্রীভগবানকে সহযোগিতা করবার উদ্দেশ্যেই যদিও বহু দেবদেবতা যদুবংশের সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ

করেছিলেন, তবুও সেই যদুবংশের কিছু সদস্য প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণের বিরোধী ছিলেন। শ্রীভগবান সম্পর্কে তাদের জড়জাগতিক তত্ত্বদর্শনের ফলেই, তারা নিজেদের যেন শ্রীকৃষ্ণেরই সমকক্ষ মনে করত। স্বয়ং পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বংশে জন্মলাভ করার ফলে, তারা অচিন্তনীয় শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারী হয়ে উঠেছিল, আর তাই শ্রীকৃষ্ণের পরম শ্রেষ্ঠ মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারেনি। শ্রীকৃষ্ণ যে পরম পুরুষোত্তম ভগবান, তা ভুলে গিয়ে, তারা বিপুল ভারস্বরূপ হয়ে উঠেছিল, এবং পরিণামে তাদের এই পৃথিবী থেকে দূর করে দেওয়াই শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে উচিত মনে হয়েছিল।

একটি প্রচলিত প্রবাদবাক্য আছে যে, বেশি ঘনিষ্ঠতা থেকেই তিক্ততা আসে। শ্রীভগবান তাঁর নিজের বংশেরই নিন্দুক বিরোধীদের নিধন করবার উদ্দেশ্যে, তাদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে, নারদমুনি এবং অন্যান্য ঋষিরা যাতে তাঁর নিজেরই বংশধর তথা কার্ষ্ণদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করতে থাকেন, তেমন আয়োজন শ্রীকৃষ্ণ করেছিলেন।

এই ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে বহু কৃষ্ণভক্ত যদুবংশীয় সদস্য আপাতদৃষ্টিতে নিহত হয়ে থাকলেও, প্রকৃতপক্ষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন অধিপতি তথা দেবতারূপে তাঁদের যথাপূর্ব মর্যাদায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। *ভগবদ্গীতায়* শ্রীভগবানের প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, তাঁর ভক্তদের তিনি সর্বদাই রক্ষা করবেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকটি সম্পর্কে তাঁর তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সমগ্র একাদশ স্কন্ধের নিম্নরূপ সারমর্ম উপস্থাপন করেছেন। প্রথম অধ্যায়ে *মৌষল-লীলা*, অর্থাৎ যদুবংশ ধ্বংসের সূচনা বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে পঞ্চম অধ্যায়ে নয়জন যোগেন্দ্র এবং নিমিরাজের কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ব্রহ্মা, শিব এবং অন্যান্য স্বর্গবাসীদের প্রার্থনার বিবরণ রয়েছে। সপ্তম থেকে ঊনত্রিশ অধ্যায় পর্যন্ত রয়েছে শ্রীকৃষ্ণ এবং উদ্ধবের কথোপকথন, যা 'উদ্ধব-গীতা' নামে পরিচিত। ত্রিংশ অধ্যায়টিতে পৃথিবী থেকে যদুবংশের অপসারণ বর্ণনা করা হয়েছে। সর্বশেষ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান লীলা বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ২

যে কোপিতাঃ সুবহু পাণ্ডুসুতাঃ সপত্নৈ-
র্দুর্দ্যূতহেলনকচগ্রহণাদিভিস্তান্ ।
কৃত্বা নিমিত্তমিতরেতরতঃ সমেতান্
হত্বা নৃপান্নিরহরৎ ক্ষিতিভারমীশঃ ॥ ২ ॥

যে—যার; **কোপিতাঃ**—ক্রুদ্ধ; **সুবহু**—বহুদিন যাবৎ বহু বার; **পাণ্ডু-সুতা**—পাণ্ডুপুত্রেরা; **সপত্নৈঃ**—দুর্যোধন প্রভৃতি শত্রুদের দ্বারা; **দুঃ-দ্যূত**—কপট দ্যূতক্রীড়ায়; **হেলন**—অবহেলা, অপমান; **কচগ্রহণ**—(দ্রৌপদীর) কেশ আকর্ষণ করে; **আদিভিঃ**—এবং অন্যান্য প্রকারে; **তান্**—তাঁদের (পাণ্ডবদের); **কৃত্বা**—করে; **নিমিত্তম্**—কারণে; **ইতর-ইতরতঃ**—পরস্পরের, উভয় পক্ষের; **সমেতান্**—সকলে একত্রিত; **হত্বা**—হত্যা করে; **নৃপান্**—রাজারা; **নিরহরৎ**—একেবারে হরণ করে; **ক্ষিতি**—পৃথিবীর; **ভারম্**—ভার; **ঈশঃ**—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

দুর্যোধন প্রভৃতি শত্রুদের কপট দ্যূতক্রীড়া, বিবিধ অবহেলা তিরস্কার, দ্রৌপদীর কেশ আকর্ষণ, এবং অন্যান্য নানাপ্রকার নিষ্ঠুর দুর্ব্যবহারে পাণ্ডুপুত্রেরা বিশেষভাবে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন বলেই পরমেশ্বর ভগবান পাণ্ডুপুত্রদের নিমিত্ত করে তাঁর অভিলাষ কার্যকরী করতে উদ্যত হন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে উপলক্ষ্য করেই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত রাজারা পৃথিবীর ভার অনাবশ্যক বৃদ্ধি করছিল, তাদের সকলকে সৈন্যসামন্ত নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝে পরস্পরবিরোধী শক্তিস্বরূপ উপস্থিত করেন, এবং শ্রীভগবান যখন সেই যুদ্ধকে উপলক্ষ্য করে তাদের বিনাশ করলেন, তখন পৃথিবী ভারমুক্ত হল।

তাৎপর্য

দুর্যোধন এবং দুঃশাসনের মতো শত্রুভাবাপন্ন কৌরবভ্রাতাদের কাছে পাণ্ডবভ্রাতারা বারংবার বিপর্যস্ত হয়েছিলেন। নির্দোষ সদাচারী নিষ্ঠাবান কৃষ্ণভক্ত পাণ্ডবদের কোনই শত্রু ছিল না, কিন্তু দুর্যোধন নিরন্তর তার অসহায় জ্ঞাতিভাইদের বিরুদ্ধে মতলব করত। একটা লাক্ষাগৃহে পাণ্ডবদের পাঠিয়ে, পরে সেই বাড়িটি ভস্মীভূত করা হয়েছিল। তাঁদের বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল, এবং তাঁদের সাধ্বী স্ত্রী দ্রৌপদীকে প্রকাশ্যে কেশ আকর্ষণ করে অপমান করা হয়েছিল, এমন কি তাঁকে বিবস্ত্রা করবার অপচেষ্টাও করা হয়। এই সমস্ত বিপর্যয়ের মাঝেও, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিরন্তর পাণ্ডবদের রক্ষা করেছেন, কারণ তাঁরা সর্বান্তঃকরণে তাঁর প্রতি আত্মসমর্পিত হয়েই থাকতেন এবং তাঁকে ছাড়া অন্য কোনও আশ্রয় তাঁদের জানা ছিল না।

এই শ্লোকে *ইতরেতরতঃ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগে, পূতনা, কেশী, অঘাসুর, এবং কংসাদি অনেক অসুরকে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বধ করেছিলেন। এবার, বাকি সমস্ত অধার্মিক মানুষগুলিকে বিনাশ করে পৃথিবীকে ভার মুক্ত করার উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণ সম্পন্ন করতে অভিলাষ করেন। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে—*কৃত্বা নিমিত্তম্*—অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং কাউকে বধ করেননি, কিন্তু তাঁর

ভক্ত অর্জুন এবং অন্যান্য পাণ্ডবদের শক্তি প্রদান করেছিলেন যাতে তাঁরা অধার্মিক রাজাদের অপসারিত করতে পারেন।

এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে এবং তাঁর সাক্ষাৎ অংশপ্রকাশ শ্রীবলরামের মাধ্যমে, তা ছাড়া পাণ্ডবদের মতো তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের মাঝে শক্তিসামর্থ্য অর্পণ করেও, যুগাবতার রূপে তাঁর লীলা বিস্তারের মাধ্যমে ধর্মনীতি সংস্থাপনের উদ্যোগে এবং পৃথিবীকে অসুরদের কবলমুক্ত করতে তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

অসুরদের নিধন করাই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মোটামুটি উদ্দেশ্য হলেও, শ্রীকৃষ্ণেরই অভিলাষ অনুসারে ভীষ্মের মতো কয়েকজন মহান ভগবদ্ভক্তকেও শ্রীভগবানের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। তবে, *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধে (১/৯/৩৯) *হত্যা গতাঃ স্বরূপম্* শব্দগুলির মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয়েছে যে, অনেক ভক্তই শ্রীভগবানের সাথে শত্রুরূপে লীলা-অভিনয় করেছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের হাতে নিহত হয়ে তাঁরা অচিরে তাঁদের নিজ নিজ দিব্য শরীর তথা স্বরূপ লাভ করে চিদাকাশে ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়েছেন। যেহেতু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরমতত্ত্ব, তাই তাঁর নিধন কার্যের মাধ্যমে তিনি যেমন পৃথিবী থেকে অসুরদের অপসারণ করেন, তেমনই তাঁর শুদ্ধ ভক্তদেরও অনুপ্রাণিত করেন।

শ্লোক ৩

ভূভাররাজপৃতনা যদুভির্নিরস্য
গুপ্তৈঃ স্ববাহুভিরচিন্তয়দপ্রমেয়ঃ ।
মন্যেঽবনের্ননু গতোঽপ্যগতং হি ভারং
যদ্ যাদবং কুলমহো অবিষহ্যমাস্তে ॥ ৩ ॥

ভূভার—পৃথিবীর ভারস্বরূপ বিদ্যমান; **রাজ**—রাজাদের; **পৃতনাঃ**—সেনাবাহিনী; **যদুভিঃ**—যাদবদের দ্বারা; **নিরস্য**—নিধন করে; **গুপ্তৈঃ**—সুরক্ষিত; **স্ববাহুভিঃ**—তাঁর নিজ হাতে; **অচিন্তয়ৎ**—তিনি চিন্তা করলেন; **অপ্রমেয়ঃ**—অপরিমিত শক্তিমান; **মন্যে**—আমি মনে করি; **অবনেঃ**—অবনীতে; **ননু**—কেউ বলতে পারে; **গতঃ**—গত হয়েছে; **অপি**—তবু; **অগতম্**—গত হয়নি; **হি**—অবশ্যই; **ভারম্**—ভার; **যৎ**—যেহেতু; **যাদবম্**—যাদবদের; **কুলম্**—বংশ; **অহো**—হে; **অবিষহ্যম্**—অসহ্য; **আস্তে**—রয়েছে।

অনুবাদ

যে সমস্ত রাজারা তাদের সৈন্যসামন্ত নিয়ে এই পৃথিবীর ভারস্বরূপ হয়ে উঠেছিল, তাদের নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান তাঁর নিজ বাহুবলে

সুরক্ষিত যদুবংশকে উপযোগ করেছিলেন। তখন অপ্রমেয়স্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করেন, "অনেকে যদিও বলছে যে, এখন পৃথিবী ভারমুক্ত হয়েছে, কিন্তু দুর্ধর্ষ যাদবকুল এখনও রয়ে গেছে বলেই, আমার মতে, এখনও তা সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়নি।"

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, শ্রীভগবান অসুরদের বধ করে, ধর্ম সংস্থাপনা প্রভৃতির মাধ্যমে এখন পৃথিবীর ভার হরণ করতে পেরেছেন বলে সাধারণ মানুষ মনে করলেও, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং লক্ষ্য করলেন যে, তাঁর নিজ পরিবারভুক্ত সদস্যেরাই এখনও পর্যন্ত অন্যায্য ক্রিয়াকলাপে নিয়োজিত থেকে তাদের ধর্মবিরোধী কাজকর্মের মাধ্যমে নিত্যনতুন বিপত্তির সঞ্চার করছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে যে, কোনও ন্যায়পরায়ণ রাজা তাঁর নিজের শত্রুকে নির্দোষ মনে করলে তাকে শাস্তি দিতে চাইবেন না, কিন্তু তাঁর পুত্র বাস্তবিকই শাস্তির যোগ্য হলে তাকে শাস্তি দেবেন। তাই জগদ্বাসীর চোখে শ্রীভগবানের আপন বংশধরেরা নিত্য পূজনীয় মনে হলেও, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ্য করলেন যে, তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতার মাধ্যমে যদুবংশের কিছু সদস্য তাঁর ইচ্ছা অবজ্ঞা করছে। যেহেতু পরম পুরুষোত্তম ভগবানের আত্মীয়স্বজন বলে যদুবংশের ঐ সমস্ত লঘুচিত্ত মানুষেরা যথেচ্ছ কাজকর্ম করতে পারে, ফলে তারা সুনিশ্চিতভাবে পৃথিবীর বিপুল ক্ষতি সাধন করবে, এবং বুদ্ধিহীন লোকে সেই সকল লঘুচিত্ত আচরণগুলিকে শ্রীকৃষ্ণের অভিলাষ বলে ধারণা করবে। তাই শ্রীভগবান, যাঁর সকল অভিলাষ অচিন্তনীয়, তিনি যদু পরিবারের অস্থিরমতি, উদ্ধত প্রকৃতির সদস্যদের বিনাশ সাধনের প্রয়োজন বোধ করতে লাগলেন।

সাধারণ মানুষদের বিবেচনায়, দ্বারকা এবং মথুরায় পরমেশ্বর ভগবানের লীলাচ্ছলে, এবং তা ছাড়া কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধেও, সমস্ত অসুর নিধন হয়ে গেছে, এবং পৃথিবী এখন অসুর দানবের ভার মুক্ত হয়েছে। তা সত্ত্বেও, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিজ পরিবারবর্গের মধ্যে অহংকারী সদস্যদের অবশিষ্ট ভার থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে, তাদের মধ্যে তিনি ভ্রাতৃবিরোধী কলহ-বিবাদ সৃষ্টির মাধ্যমে পৃথিবীর বুক থেকে তাদের সরিয়ে দিয়েছিলেন। এইভাবে তিনি জগৎ থেকে তাঁর নিজের অন্তর্ধানের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

শ্রীধর স্বামী *বাহুভিঃ* "তাঁর বাহুগুলির সাহায্যে" এই শব্দটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন যে, এই শব্দটি দ্বিবচনের পরিবর্তে বহুবচনে প্রয়োগ করার ফলে

প্রতীয়মান হয়—যদুবংশ ধ্বংসকার্যে শ্রীভগবান তাঁর চতুর্ভুজরূপ ধারণ করেছিলেন। গোবিন্দরূপে শ্রীকৃষ্ণের মূল আকৃতি দ্বিভুজ, তবে চতুর্ভুজ নারায়ণের অংশপ্রকাশ রূপেই শ্রীভগবান জগতের সমস্ত অসুরকুল বিনাশ করেছিলেন এবং পরিশেষে তাঁর নিজ পরিবারভুক্ত দুর্বিষহ সদস্যগুলিকেও অপসারণ করেছিলেন। প্রশ্ন হতে পারে, যদু পরিবারের কয়েকজন যদি শ্রীভগবানের ইচ্ছা পালনে বিমুখ হয়ে থাকে, তবে তারা পৃথিবী থেকে তাদের অপসারণের জন্য তাঁর পরিকল্পনার বিরোধিতা করেনি কেন? তাই *অপ্রমেয়* শব্দটি প্রয়োগের মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয়েছে যে, শ্রীভগবানের ইচ্ছা পরিপূর্ণভাবে অবগত হওয়া কারও পক্ষে, এমন কি শ্রীভগবানের আপন পরিবারভুক্ত সদস্যদের পক্ষেও, অসম্ভব ব্যাপার।

শ্রীল জীব গোস্বামী যদুবংশ ধ্বংসের অন্য একটি কারণ দিয়েছেন। তিনি দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের ক্রিয়াকর্ম কখনই সাধারণ জড়-জাগতিক কাজের মতো মনে করা উচিত নয়। শ্রীভগবানের পার্ষদেরাও সাধারণ মানুষ নন।

যদিও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপাতদৃষ্টিতে কিছুকালের জন্য এই পৃথিবীর মাঝে অবতাররূপে আসেন এবং তার পরে অন্তর্হিত হন, তা হলেও জানতে হবে যে, পরমেশ্বর ভগবান চিদাকাশে অবস্থিত শ্রীগোকুলধাম, মথুরাধাম এবং দ্বারকা ধামের মতো তাঁর বিভিন্ন ধামে নিত্যকালই তাঁর পরিভ্রমণে বিরাজমান থাকেন। যদুবংশের সকল সদস্যই শ্রীভগবানের নিত্য পার্ষদ, তাই শ্রীভগবানের সাথে বিচ্ছেদ বিরহে তাঁরা নিরুদ্বিগ্ন হতে পারেন না।

যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ তাঁর জাগতিক লীলা সংবরণ করতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন, তাই পৃথিবীর বুকে যদুবংশ তিনি রেখে গেলে, তাঁর অবর্তমানে তাদের প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ মানসিকতা নিয়ে তারা পৃথিবীকে পদদলিত করে ধ্বংস করে ফেলতে পারত। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিজের অন্তর্ধানের আগেই যদুবংশ ধবংস করার আয়োজন করেছিলেন।

শ্রীল জীব গোস্বামীর সিদ্ধান্ত এই যে, যদুবংশের সদস্যদের আদপেই অধার্মিক বিবেচনা করা উচিত নয়। বৈষ্ণব আচার্যগণ মন্তব্য করেছেন যে, জড়জাগতিক জীবনের বন্ধনদশা থেকে বদ্ধ জীবকুলের মুক্তিলাভে সহায়তা করবার জন্যই বিশেষভাবে যদুবংশ লুপ্ত হওয়ার কাহিনীর তাৎপর্য অনুধাবন যোগ্য।

যদুবংশের মতো শক্তিধর এবং ঐশ্বর্যবান ত্রিভুবনে আর কেউ ছিল না। পরম পুরুষোত্তম ভগবান ছিলেন শ্রী, বীর্য, জ্ঞান, যশ এবং বিবিধ অনন্ত, ঐশ্বর্যের অধিকারী—এবং যদুবংশের সদস্যেরা শ্রীভগবানের একান্ত পার্ষদ ছিলেন বলেই,

তাঁরাও অচিন্তনীয় ঐশ্বর্যে মহিমামণ্ডিত হয়েছিলেন। সুতরাং, যখন আমরা লক্ষ্য করি কিভাবে একটা ভ্রাতৃহন্তী যুদ্ধবিবাদ অকস্মাৎ যদুবংশের সকলের সমস্ত জাগতিক সম্পদ এবং তাদের সকলের প্রাণও হরণ করে নিল, তখন আমরা বুঝতে পারি যে, এই জড়জাগতিক পৃথিবীর মাঝে কোনও বিষয়েরই চিরকালের মর্যাদা থাকে না।

পরোক্ষভাবে বলতে গেলে, যদুবংশের সকলে শ্রীভগবানের নিত্য পার্ষদ হলেও এবং শ্রীভগবান যখন অন্য গ্রহলোকে আবির্ভূত হলেন, তখন তাঁরাও তৎক্ষণাৎ সেই গ্রহে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেও, এই জগতের নশ্বর প্রকৃতির তাৎপর্য সম্পর্কে বদ্ধ জীবদের যথার্থ উপলব্ধি সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই ভ্রাতৃহন্তী যুদ্ধবিবাদের মাধ্যমে অকস্মাৎ তাঁদের অন্তর্হিত হওয়ার কারণ বোঝা যায়।

অতএব, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যদুবংশের কিছু সদস্যের আপাতবিরোধ তথা শত্রুতা তাদের ক্ষেত্রে যথার্থই অধর্ম মনে করা উচিত হবে না। বদ্ধ জীবকুলকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই সমগ্র পরিস্থিতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণই রচনা করেন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীল জীব গোস্বামী *শ্রীমদ্ভাগবত* থেকে বিভিন্ন শ্লোক চয়ন করে প্রতিপাদনের প্রয়াস করেছেন যে, অসংখ্য ধর্মাচরণের মাধ্যমে এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা-অনুশীলনে পরিপূর্ণভাবে আত্মমগ্ন হয়ে শ্রীভগবানের আপন পরিবার পরিজনেরা সমুন্নত জন্ম লাভই করেছিলেন।

বাস্তবিকই, শয়নে-স্বপনে চলনে-বলনে, তাঁরা শুধুমাত্র কৃষ্ণকথাই চিন্তাভাবনা করতেন বলে তাঁরা নিজেদের কথা চিন্তা করতেই পারতেন না।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে (১/১৫/৩৩) যদুবংশের অন্তর্ধান সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন—"সূর্যাস্ত কখনই সূর্যের অন্তিমকাল বোঝায় না।" তার অর্থ এই যে, সূর্য আমাদের দৃষ্টির অগোচর হয়েছে। তেমনই কোনও বিশেষ গ্রহে কিংবা ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীভগবানের লীলা সাধন সমাপ্ত হলেই বুঝতে হয় তিনি আমাদের দৃষ্টির অগোচর হলেন। তেমনই, যদুবংশের সমাপ্তি থেকে বোঝায় না যে, বংশটি ধ্বংস হয়ে গেল। সেটি শ্রীভগবানের সাথে অন্তর্হিত হয়ে আমাদের দৃষ্টির অগোচর হল।

শ্লোক ৪

নৈবান্যতঃ পরিভবোঽস্য ভবেৎ কথঞ্চিন্-
মৎসংশ্রয়স্য বিভবোন্নহনস্য নিত্যম্ ।
অন্তঃ কলিং যদুকুলস্য বিধায় বেণু-
স্তম্বস্য বহ্নিমিব শান্তিমুপৈমি ধাম ॥ ৪ ॥

ন—না; এব—অবশ্যই; অন্যতঃ—অন্য কারণেও; পরিভবঃ—পরাভব; অস্য—এই বংশের; ভবেৎ—হতে পারে; কথঞ্চিৎ—কোনও উপায়ে; মৎ-সংশ্রয়স্য—আমার আশ্রয় গ্রহণ করেছে; বিভব—তার বৈভবে; উন্নহনস্য—উচ্ছৃঙ্খল; নিত্যম্—সদাসর্বদা; অন্তঃ—মধ্যে; কলিম্—কলহ; যদুকুলস্য—যদুবংশের; বিধায়—উৎপত্তি; বেণুস্তম্বস্য—বাঁশগাছের মধ্যে; বহ্নিম্—আগুন; ইব—মতো; শান্তিম্—শান্তি; উপৈমি—উপনীত হব; ধাম্—নিজ ধামে।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করেছিলেন, "নিরন্তর আমার প্রতি পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পিত এবং তাঁদের বীর্য ঐশ্বর্য বৈভবাদির ফলে উচ্ছৃঙ্খল এই যদুবংশের সদস্যদের বাইরের কোনও শক্তি পরাভূত করতে কখনই পারবে না। তবে যদি এই বংশের মধ্যে কলহ-বিবাদ সৃষ্টি করে দিই, তা হলে বাঁশবনের মধ্যে বাঁশগুলির পরস্পর সংঘর্ষণের ফলে যেমন আগুন সৃষ্টি হয়, তবে তাদের অন্তর্কলহ ঠিক সেইভাবে যদুবংশ ধ্বংস করতে পারবে, এবং তখনই আমার যথার্থ উদ্দেশ্য সাধিত হবে আর আমি নিজধামে ফিরে যাব।"

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশের মানুষদের তিরোহিত করবার ব্যবস্থা করতে চাইলেও, তিনি স্বয়ং তাদের ঠিক অসুরদের মতো বধ করতে পারেননি, কারণ যদুবংশ ছিল তাঁরই আপন পরিবার-পরিজন। কেউ হয়ত প্রশ্ন করতে পারে যে, তিনি অন্যদের দিয়ে তাদের নিধনের আয়োজন করেননি কেন? তাই এই শ্লোকে বলা হয়েছে—*নৈবান্যতঃ পরিভবোঽস্য ভবেৎ কথঞ্চিৎ*—কারণ যদুবংশ ছিল শ্রীভগবানেরই আপন পরিবার-পরিজন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেউই, এমন কি দেবতারাও, তাদের বধ করতে পারত না।

বস্তুত, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, যদুবংশের পরিবার পরিজনদের পরাভূত করা কিংবা নিধন করা তো দূরের কথা, তাঁদের অবমাননা করবারও কোনও সাধ্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কারও ছিল না। তার কারণ এখানে *মৎসংশ্রয়স্য* শব্দসমষ্টির মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে। যদুবংশের সকল সদস্যই পরিপূর্ণভাবে শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় স্বীকার করে নিয়েছিলেন, এবং তাই তাঁরা নিয়তই শ্রীভগবানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বিরাজ করতেন। বাংলা প্রবাদবাক্যে বলা হয়ে থাকে, *মারে কৃষ্ণ রাখে কে, রাখে কৃষ্ণ মারে কে*—যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কাউকে রক্ষা করেন, তবে কেউ তাকে মারতে পারে না, আর শ্রীকৃষ্ণ যদি কাউকে মারতে চান, তা হলে তাকে কেউ বাঁচাতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণ গোড়াতেই তাঁর লীলাবিহারে তাঁর সাথে সহযোগের জন্য দেবতাগণ সহ তাঁর পার্ষদবর্গকে মর্ত্যে অবতরণের জন্য বলেছিলেন। যেহেতু এখন এই বিশেষ গ্রহক্ষেত্রটিতে তাঁর লীলাবিচরণ সমাপ্তির পথে, তাই এই পৃথিবী থেকে তাঁর সমস্ত পার্ষদবর্গকে অন্য গ্রহক্ষেত্রে অপসারণের অভিলাষ তিনি করেছিলেন, যাতে তারা কোনও ভার সৃষ্টি করতে না পারে। শ্রীকৃষ্ণের অবর্তমানে তাঁর আপন পরিবার-পরিজন এবং সৈন্যসামন্ত সহ শক্তিমান যদুবংশটিকে যেহেতু কারও পক্ষে পরাভূত করার সাধ্য ছিল না, তাই শ্রীকৃষ্ণ এক অন্তর্দ্বন্দ্বের আয়োজন করে দিয়েছিলেন, ঠিক যেমন ভাবে কখনও বাঁশবনের মধ্যে বাতাসের ফলে বাঁশে বাঁশে ঘর্ষণের মাধ্যমে আগুন জ্বলে উঠে, সারা বন জঙ্গল জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যায়।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, যদু পরিবারের দুঃসাহসিক কার্যকলাপের কথা শুনে সাধারণ মানুষ মনে করতেই পারে যদুবংশের বীরকুল বুঝি, শ্রীকৃষ্ণের মতোই পূজনীয় কিংবা তাঁরাও বুঝি স্বনিয়ন্তা। পরোক্ষভাবে বলতে গেলে, মায়াবাদী দর্শনতত্ত্বের মাধ্যমে কলুষিত হওয়ার ফলেই সাধারণ মানুষ হয়ত যদুবংশকে এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের সমপর্যায়ভুক্ত মনে করতে পারে। তাই, পরমেশ্বর ভগবানের সমকক্ষ হওয়া কিংবা তাঁকে অতিক্রম করা সর্বশক্তিমান জীবের পক্ষেও যে কখনই সম্ভব নয়, তা প্রতিপন্ন করবার জন্যই, শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশের ধ্বংস সাধনের আয়োজন করেন।

শ্লোক ৫

এবং ব্যবসিতো রাজন্ সত্যসঙ্কল্প ঈশ্বরঃ ।
শাপব্যাজেন বিপ্রাণাং সঞ্জহ্রে স্বকুলং বিভুঃ ॥ ৫ ॥

এবম্—এইভাবে; **ব্যবসিতঃ**—মনস্থির করে; **রাজন্**—হে রাজন; **সত্য-সঙ্কল্পঃ**—যাঁর সঙ্কল্প নিত্য সত্য হয়; **ঈশ্বরঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **শাপ-ব্যাজেন**—একটি অভিশাপের ছলনায়; **বিপ্রাণাম্**—ব্রাহ্মণদের; **সঞ্জহ্রে**—সম্বরণ করেন; **স্ব-কুলম্**—নিজ বংশ; **বিভুঃ**—সর্বনিয়ন্তা।

অনুবাদ

হে পরীক্ষিৎ মহারাজ, পরম নিয়ন্তা সত্যসঙ্কল্প শ্রীভগবান যখন এইভাবে মনস্থির করলেন, তখন তিনি কোনও এক ব্রাহ্মণমণ্ডলীর অভিশাপের ছলনায় তাঁর নিজ যাদবকুল বিলুপ্ত করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই শ্লোকটি সম্পর্কে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অভিলাষাদি যেহেতু

নিত্য সত্য হয়, তাই সমগ্র জগতেরই মহত্তম কল্যাণার্থে তিনি নিশ্চয় ব্রহ্মশাপের ছলনায় তাঁর নিজ পরিবারবর্গ ধ্বংস করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর নিজ ভক্তরূপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাবিস্তারকালে অনুরূপ অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর স্বাংশপ্রকাশরূপে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, এবং তাঁর সঙ্গে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু পরিচয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এবং শ্রীঅদ্বৈত প্রভু—তিনজন মহাপুরুষকেই বৈষ্ণব আচার্যগণ পরম পুরুষোত্তম ভগবানের পূর্ণ মর্যাদায় 'বিষ্ণুতত্ত্ব' স্বরূপ স্বীকার করেছেন। এই তিনজন ভগবৎ-পুরুষ অনুধাবন করেছিলেন যে, ভবিষ্যতে তাঁদের অনুগামীরা অনাবশ্যক গুরুত্ব লাভ করে গর্বোস্ফীত হবে এবং তার ফলে তারা যথার্থ বৈষ্ণব গুরুবর্গ তথা শ্রীভগবানের প্রতিভূস্বরূপ সকলের বিরুদ্ধে ঘোরতর অপরাধ করতে থাকবে।

ভগবদ্গীতায় যেভাবে বলা হয়েছে (*মমৈবাংশঃ*), সেই অনুযায়ী প্রত্যেক জীবই পরমেশ্বর ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রত্যেক জীবই মূলতঃ শ্রীভগবানের সন্তান, তা সত্ত্বেও ভগবান তাঁর লীলা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে অতি উত্তম যোগ্যতাসম্পন্ন কিছু জীবকে মনোনীত করে থাকেন, যাঁরা তাঁরই আপন আত্মীয়স্বজনরূপে জন্ম গ্রহণের অনুমোদন লাভ করেন।

কিন্তু শ্রীভগবানের বংশধর হয়ে যে সমস্ত জীবকুল আবির্ভূত হন, তাঁরা অবশ্যই সেই বংশমর্যাদায় গর্বোদ্ধত হয়ে উঠতে পারেন এবং তার ফলে সাধারণ মানুষদের কাছে তাঁরা যে বিপুল মর্যাদা লাভ করেন, তার অবমাননা করে থাকেন এইভাবে ঐ সমস্ত মানুষেরা কৃত্রিম আচরণের মাধ্যমে অনাবশ্যক মনোযোগ আকর্ষণ করলেও, শ্রীভগবানের শুদ্ধ ভক্তদের কাছে আত্মনিবেদনের মাধ্যমে পারমার্থিক উন্নতি সাধনের যথার্থ নীতি অনুসরণে মানুষকে বিভ্রান্ত করে থাকেন।

ভগবদ্গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের শেষ আটটি শ্লোকে যে সকল শুদ্ধ ভক্তদের শ্রীভগবান আচার্যবর্গ তথা মানবজাতির পারমার্থিক নেতারূপে কর্তব্য সম্পাদনের অধিকারী করেছেন, তাঁদের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

পরোক্ষভাবে বলতে গেলে, শ্রীকৃষ্ণের আপন পরিবারবর্গের মধ্যে শুধুমাত্র জন্মগ্রহণ করলেই পারমার্থিক গুরুদেব হয়ে ওঠার যোগ্যতা লাভ করা যায় না, যেহেতু *ভগবদ্গীতা* অনুসারে, *পিতাহম্ অস্য জগতঃ*—প্রত্যেক জীবই নিত্যকাল শ্রীভগবানের পরিবারভুক্ত। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* বলেছেন, *সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ*—"আমি সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন। কেউ আমার শত্রু নয়, এবং কেউ আমার বিশেষ বন্ধুও নয়।" যদুবংশের মতো কোনও বিশেষ

পরিবারগোষ্ঠীকে যদিও পরম পুরুষোত্তম ভগবানেরই একান্ত পরিবার পরিজন বলে মনে হতে পারে, তা হলেও তা বদ্ধজীবদের আকৃষ্ট করবার উদ্দেশ্যেই শ্রীভগবানের লীলাবিস্তারের বিশেষ আয়োজন মাত্র। যখন শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হন, তখন তিনি সাধারণ মানুষের মতোই কাজ করেন, যাতে তাঁর লীলাবৈচিত্র্যে জীবকুল আকৃষ্ট হয়। সুতরাং প্রত্যেক জীবই বস্তুত তাঁর পরিবারগোষ্ঠীর সদস্য হলেও, তিনি যদু-বংশকে আপন পরিবার-পরিজনরূপে অভিব্যক্ত করেছিলেন।

অবশ্য, পারমার্থিক ধ্যান-জ্ঞানের মহত্তর নীতিসূত্রগুলি অনুধাবন না করার ফলে, সাধারণ মানুষ সহজেই যথার্থ সদ্‌গুরুর প্রকৃত গুণাবলী বিস্মৃত হয়ে থাকে এবং তার পরিবর্তে শ্রীভগবান তথা শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরিবারভুক্ত বলে পরিচিত যে কোনও মানুষ জন্মগ্রহণ করলেই তাকে অনাবশ্যক গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই কোনও সন্তানাদি না রেখে গিয়ে মানুষের যথার্থ পারমার্থিক চেতনাবিকাশের পথে এই ধরনের প্রতিবন্ধকতা পরিহার করে গেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দু'বার বিবাহিত হলেও, তিনি নিঃসন্তান ছিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও পরম পুরুষোত্তম ভগবান, তিনি তাঁর নিজ পুত্র শ্রীবীরভদ্রের ঔরসজাত কোনও পুত্রকেই স্বীকার করে নেননি। তেমনই, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুও তাঁর পুত্রদের মধ্যে অচ্যুতানন্দ এবং অন্য দু'জন ছাড়া অন্য সকল পুত্রদের ত্যাগ করেছিলেন। অদ্বৈত আচার্যের প্রধান বিষ্ণু পুত্র অচ্যুতানন্দের ঔরসে কোনও সন্তান ছিল না, এবং শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর অন্যপুত্রের মধ্যে অবশিষ্ট তিনজন ভগবদ্ভক্তিমার্গ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে, আর তাই ত্যাজ্য পুত্র রূপেই তারা পরিচিত হয়।

অন্যভাবে বলতে গেলে, ঔরসজাত পরিবার-পরিজনের নামে বংশপরম্পরাগত-ভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার তেমন কোনও সুযোগই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের ফলে ঘটবার অবকাশ ছিল না। বৈদিক প্রামাণ্যসূত্রে যথার্থভাবে পরমতত্ত্ব যিনি উপলব্ধি করেছেন, তাঁর পক্ষে স্মার্ত ভাবধারার বিরোধী ঔরসজাত বংশানুক্রমের ধারণাটির প্রতি আস্থা পোষণ করা যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না।

অন্যান্য আচার্যবর্গও এই বিষয়টি সম্পর্কে তাঁদের নিজ নিজ পরিবারবর্গের মধ্যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছেন। এই *শ্রীমদ্ভাগবত* গ্রন্থসম্ভারের শক্তিমান গ্রন্থকার, আমাদের পরমারাধ্য আপন গুরুদেব, কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ শুদ্ধ ভক্তকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এবং তাঁর শৈশব থেকেই শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির সকল প্রকার লক্ষণাদি তিনি স্বয়ং প্রদর্শন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ অবশেষে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে আসেন এবং সারা পৃথিবীতে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অভূতপূর্ব পারমার্থিক শক্তিমত্তা প্রদর্শন করেন। মাত্র

কয়েক বছরের মধ্যেই, তিনি বৈদিক দর্শনতত্ত্বের পঞ্চাশখানিরও বেশি বৃহদাকার গ্রন্থরাজি অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর বাস্তবসম্মত ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে তিনি সুনিশ্চিতভাবেই শ্রীভগবানের একজন পরম শক্তিমান প্রতিভূরূপে স্বীকৃত হয়েছেন। তা সত্ত্বেও, তাঁর নিজ পরিবারের সদস্যরা, কৃষ্ণভক্ত হলেও, ভগবদ্ভক্তির যথার্থ পর্যায়ে উপনীত হতে পারেনি এবং তাই ইসকনের সদস্যমণ্ডলী তাঁদের প্রতি মনোযোগী হয়নি।

শ্রীল প্রভুপাদের নিকটতম পরিবারবর্গের সদস্যদের প্রতি সকল প্রকার শ্রদ্ধা-ভক্তি নিবেদন করা আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সঙ্ঘের সদস্যদের স্বাভাবিক প্রবণতা হতে পারত। কিন্তু যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের ব্যবস্থাক্রমে এই সমস্ত পরিবার-পরিজনেরা শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির স্তরে অবস্থিত হননি, তাই ইসকনের সদস্যমণ্ডলী তাঁদের প্রতি তেমন কোনই আগ্রহ প্রদর্শন করেন না, কিন্তু তার পরিবর্তে যে সব মানুষ জন্মসূত্রে না হলেও, পরম উন্নত বৈষ্ণবদের গুণাবলী যথার্থই বিকশিত করেন, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকেন। পরোক্ষ ভাবে, শ্রীভগবানের আপন পরিবারগোষ্ঠীতে, কিংবা কোনও আচার্যের পরিবারে, এমন কি সাধারণ কোনও বর্ধিষ্ণু বা বিদ্বান পরিবারে কেউ জন্মগ্রহণ করলেও, শুধুমাত্র জন্মসূত্রে কোনও মানুষের পক্ষে শ্রদ্ধাভাজন হয়ে ওঠার যোগ্যতা লাভ হয় না।

ভারতবর্ষে 'নিত্যানন্দবংশ' নামে পরিচিত এক শ্রেণীর মানুষ আছে, যারা নিজেদের শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সাক্ষাৎ বংশধর বলে দাবি করে থাকে, আর তাই ভগবদ্ভক্তির ক্ষেত্রে তাদের সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী মনে করে। এই প্রসঙ্গে, শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে লিখেছেন, "মধ্যযুগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহান্ পার্ষদ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর তিরোধানের পরে, এক শ্রেণীর পূজারী-পুরোহিতেরা নিজেদের 'গোস্বামী' জাতিভুক্ত পরিচয় দিয়ে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশধর রূপে দাবি করতে থাকে। তারা আরও দাবি করতে থাকে যে, ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন এবং প্রসারের অধিকার তথা দায়িত্ব একমাত্র 'নিত্যানন্দবংশ' নামে পরিচিত তাদেরই বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শক্তিমান আচার্য শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাদের এই ধারণা সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত না করা পর্যন্ত বেশ কিছুদিন যাবৎ তারা তাদের ভেক-শক্তির আস্ফালন হয়েছিল। কিছুকাল তা নিয়ে বিপুলভাবে কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছিল, তবে তা সার্থক প্রতিপন্ন হয়, এবং যখন যথাযথ বাস্তবসম্মত উপায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, কোনও বিশেষ শ্রেণীভুক্ত মানুষদের কাছেই ভগবদ্ভক্তি সেবার অধিকার সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। তা ছাড়া,

ভক্তিসেবায় নিয়োজিত যে কোনও মানুষই উচ্চপর্যায়ের ব্রাহ্মণ হয়ে ওঠেন। তাই এই আন্দোলনের মাধ্যমে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের সংগ্রাম সার্থকতা অর্জন করে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে কোনও প্রান্তের যে কোনও মানুষ তার যোগ্যতার মর্যাদা অনুসারে গৌড়ীয় বৈষ্ণব হয়ে উঠতে পারে।"

অন্যভাবে বলতে গেলে, পারমার্থিক জ্ঞানের সারমর্ম হল এই যে, প্রত্যেক জীব তার বর্তমান জন্মসূত্র নির্বিশেষে মূলতঃ পরমেশ্বর ভগবানের দাস তথা সেবক, এবং এই সমস্ত পতিত জীবকুল উদ্ধার করাই শ্রীভগবানের লক্ষ্য।

যে কোনও জীব তার পূর্ব মর্যাদা ব্যতিরেকেই যদি পরমেশ্বর ভগবানের কিংবা তাঁর সুযোগ্য প্রতিভূর চরণকমলে আবার আত্মসমর্পণ করতে অভিলাষী হয়ে, ভক্তিযোগের বিধিনিয়ম কঠোরভাবে পালন করার মাধ্যমে নিজেকে শুদ্ধ করে তুলতে পারে, তা হলে সে উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণের মতো কাজ করতে থাকবে।

তা সত্ত্বেও শ্রীভগবানের ঔরসজাত বংশধরেরা তাদের পূর্বপুরুষদের চারিত্রিক গুণাবলী এবং মানমর্যাদার অধিকারী হয়ে গিয়েছে বলে অভিমান করে থাকে। তাই, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী এবং বিশেষত তাঁর ভক্তমণ্ডলীর কল্যাণকামী পরমেশ্বর ভগবান এমনভাবে তাঁর আপন বংশধরদের বিভেদমূলক শক্তিসামর্থ্যকে বিভ্রান্ত করে থাকেন যে, এই সমস্ত ঔরসজাত বংশধরেরা বিভেদকামী রূপেই সর্বসমক্ষে প্রতিভাত হয় এবং শ্রীকৃষ্ণের অভিলাষ পূরণের উদ্দেশ্যে অকৃত্রিম আত্মসমর্পণের মাধ্যমে শ্রীভগবানের প্রতিভূ হয়ে ওঠার যথার্থ যোগ্যতা স্বীকৃত হতে পারে।

শ্লোক ৬-৭

স্বমূর্ত্যা লোকলাবণ্যনির্মুক্ত্যা লোচনং নৃণাম্ ।
গীর্ভিস্তাঃ স্মরতাং চিত্তং পদৈস্তানীক্ষতাং ক্রিয়াঃ ॥ ৬ ॥
আচ্ছিদ্য কীর্তিং সুশ্লোকাং বিতত্য হ্যঞ্জসা নু কৌ ।
তমোঽনয়া তরিষ্যন্তীত্যগাৎ স্বং পদমীশ্বরঃ ॥ ৭ ॥

স্বমূর্ত্যা—তাঁর নিজ অঙ্গ প্রভার দ্বারা; **লোক**—নিখিল বিশ্বে; **লাবণ্য**—সৌন্দর্য; **নির্মুক্ত্যা**—আকর্ষণ করে; **লোচনম্**—নয়ন আকর্ষণ করেন; **নৃণাম্**—জনগণের; **গীর্ভিঃ**—তাঁর নিজ বচনের দ্বারা; **তাঃ স্মরতাং**—যারা সেইগুলি স্মরণ করে; **চিত্তম্**—মন; **পদৈঃ**—তাঁর পদচিহ্ন দ্বারা; **তান্ ঈক্ষতাম্**—যারা তাঁকে দর্শন করে; **ক্রিয়াঃ**—গমনাদি ক্রিয়াকলাপ; **আচ্ছিদ্য**—আকৃষ্ট; **কীর্তিম্**—তাঁর মাহাত্ম্য; **সু-শ্লোকাম্**—উত্তম কাব্যের মাধ্যমে প্রশংসিত; **বিতত্য**—বিস্তারিত; **হি**—অবশ্যই; **অঞ্জসা**—

সহজেই; নু—অবশ্যই; কৌ—পৃথিবীতে; তমঃ—অজ্ঞানতা; অনয়া—সেই সকল কীর্তির ফলে; তরিষ্যন্তি—পার হবে; ইতি—সেই চিন্তার মাধ্যমে; অগাৎ—গমন করেন; স্বম্—নিজ; পদম্—অবস্থান; ঈশ্বরঃ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিখিল বিশ্বের সকল সৌন্দর্যের আধারস্বরূপ। যা কিছু মনোরম, তা সবই তাঁর থেকেই উৎসারিত হয়, এবং তাঁর অঙ্গপ্রভা এমনই সুন্দর যে, অন্য সকল বিষয় থেকে তা দৃষ্টি আকর্ষণ করার ফলে সব কিছুই তাঁর সৌন্দর্যের তুলনায় হতশ্রী হয়ে যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন মর্ত্যলোকে বিরাজমান ছিলেন, তখন তিনি সকল মানুষেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। যখন শ্রীকৃষ্ণ কথা বলতেন, তখন তাঁর স্মরণমুগ্ধ সকল মানুষেরই মন তাতে আকৃষ্ট হত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দর্শন করে তাঁর প্রতি তারা শ্রদ্ধান্বিত বোধ করত, এবং তার ফলে তাঁর অনুগামী হয়ে শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে তাদের সকল ক্রিয়াকর্মাদি সমর্পণ করতে অভিলাষী হত। এইভাবেই শ্রীকৃষ্ণ অনায়াসেই তাঁর পুণ্যকীর্তি বিস্তারের মাধ্যমে অতি মনোরম এবং অপরিহার্য বৈদিক কাব্যগাথা সৃষ্টি করে বিশ্ববন্দিত হয়েছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিবেচনা করেছিলেন যে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বদ্ধজীবকুল ঐ সকল মাহাত্ম্য শুধুমাত্র শ্রবণ এবং কীর্তনের মাধ্যমেই অজ্ঞানতার অন্ধকারময় সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হতে পারবে। এই আয়োজনে সন্তুষ্ট হয়ে, তাঁর অভীষ্ট স্বধামে তিনি চলে যান।

তাৎপর্য

শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে সকল উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত অবতরণ করেছিলেন, তা সকলই সাধিত হওয়ার পরে তিনি তাঁর চিন্ময়ধামে প্রত্যাবর্তন করেন। সুন্দর কিছু দেখার জন্য জড় জগতের মানুষ আকুল হয়, তা খুবই সাধারণ ব্যাপার। জড়জাগতিক জীবনধারায় অবশ্য আমাদের চেতনা প্রকৃতির ত্রৈগুণ্য প্রভাবে কলুষিত হয়ে থাকে, আর তাই সৌন্দর্য এবং তৃপ্তিসুখের জড়জাগতিক সব বিষয়ে আমরা আকুলিত হই। ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জড়-জাগতিক পদ্ধতি কখনই শুদ্ধ হয় না, কারণ জড়-জাগতিক জীবনে সুখী অথবা পরিতৃপ্ত হওয়ার কোনও সুযোগই জড়-জাগতিক নিয়মবিধির মাধ্যমে আমরা অর্জনের অধিকার পাই না।

এর কারণ এই যে, জীবমাত্রই ভগবানের নিত্যদাস স্বরূপ, এবং পরমেশ্বর ভগবানের অনন্ত রূপ আর আনন্দ উপলব্ধির উদ্দেশ্যেই তার সৃষ্টি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরম তত্ত্বস্বরূপ এবং সকল সৌন্দর্য আর আনন্দের উৎস তথা আধার। শ্রীকৃষ্ণের

সেবার মাধ্যমে তাঁর সেই সৌন্দর্য এবং আনন্দের সমুদ্রে আমরাও অবগাহনের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারি, এবং তার ফলেই সব কিছু সুন্দর জিনিস দেখার আনন্দ আর জীবনকে উপভোগের সকল আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করবে।

এই সম্পর্কে দৃষ্টান্ত প্রদান করে বলা যায় যে, আমাদের হাত কখনই আপন স্বাধীনতায় কোনও আহার সামগ্রী ভোগ করতে পারে না, তবে উদরের মধ্যে আহারাদি পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থায় পরোক্ষভাবে হাত আমাদের সহযোগিতা করতে পারে। সেইভাবেই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা অনুশীলনের মাধ্যমেই জীব শ্রীভগবানের অবিচ্ছেদ্য বিভিন্ন অংশরূপে অনন্ত, অপরিসীম, আনন্দ লাভের বাসনা চরিতার্থ করবে।

অচিন্ত্য শক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর আপন যথার্থ রূপ অভিব্যক্ত করার মাধ্যমে তাঁর রূপ ছাড়া অন্য কোনও প্রকার সৌন্দর্যের বৃথা অন্বেষণের প্রচেষ্টা থেকে জীবকুলকে মুক্ত করে থাকেন, কারণ সকল সুন্দর বস্তুরই উৎস তাঁর সেই যথার্থ রূপ ঐশ্বর্য।

কেবল শ্রীভগবানের চরণকমল দর্শন করলেই, ভাগ্যবান জীবেরা কর্মীশ্রেণীর মানুষদের ভগবৎ-বিমুখ সকল প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদের নিজেদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তিসাধনের জন্য স্থূল প্রকৃতির আনন্দ উপভোগের যে প্রবৃত্তি, এবং শ্রীভগবানের সেবার মাধ্যমে নিজের সকল ক্রিয়াকর্ম ওতঃপ্রোতভাবে সংযোজিত করবার অনুশীলনের যে-সার্থকতা, তার মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন করতে পারে।

শ্রীভগবানের প্রকৃত সত্তা সম্পর্কে চিরকালই দার্শনিকেরা চিন্তা-ভাবনা করে চলতে থাকলেও, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর যথার্থ অপ্রাকৃত রূপ এবং ক্রিয়াকলাপ অভিব্যক্তির মাধ্যমে তাঁর সম্পর্কে সকল প্রকার কল্পনাশ্রিত ভ্রান্ত ধ্যানধারণার কবল থেকে জীবকুলকে প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিপ্রদান করেছেন। তাই আপাতদৃষ্টিতে, শ্রীকৃষ্ণের মানবীয় রূপ, কথাবার্তা এবং কার্যকলাপ সবই সাধারণ বদ্ধ জীবের অনুরূপ হয়ে থাকে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই বিষয়ে ব্যাখ্যা করেছেন যে, শ্রীভগবানের ক্রিয়াকলাপ এবং জীবকুলের কাজকর্মের মধ্যে এই যে আপাত সাদৃশ্য, তা শ্রীভগবানেরই কৃপাময় অনুগ্রহ, যার ফলে বদ্ধ জীবগণ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং সৎ-চিৎ-আনন্দ তথা নিত্যকালের মতো চিরস্থায়ী শুদ্ধ জ্ঞান আর আনন্দ-তৃপ্তির অনন্ত জীবন লাভের উদ্দেশ্যে শ্রীভগবানের নিজ ধামে প্রত্যাবর্তনের যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। জীবকুলের সহজ বোধগম্য উপায়ে শ্রীভগবান তাঁর চিন্ময় স্বরূপ প্রদর্শন এবং দিব্যধামের বর্ণনার মাধ্যমে, তিনি তাদের অসার ভোগ প্রবৃত্তি দূর করেন এবং তাঁর পুরুষসত্তার প্রতি তাদের দীর্ঘকালের অনীহার নিরসন করেন।

ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণের পরম পুরুষোত্তম ভগবত্তার মর্যাদা মানুষ উপলব্ধি করতে পারলে, জড়জাগতিক মোহজালের মধ্যে আর কখনই সে অধঃপতিত হবে না। প্রামাণ্য বৈদিক শাস্ত্রসম্ভার থেকে শ্রীভগবানের অতুলনীয় দিব্য রূপ এবং সৌন্দর্যের বিষয় যদি নিত্য কেউ শ্রবণ করে, তা হলে মানুষ অধঃপতন পরিহার করতে পারে।

ভগবদ্গীতায় (২/৪২-৪৩) তাই ব্যাখ্যা করা হয়েছে—

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্ ।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি ॥

"বিবেকবর্জিত মানুষেরাই বেদের পুষ্পিত বাক্যে আসক্ত হয়ে স্বর্গসুখ ভোগ, উচ্চকুলে জন্ম, ক্ষমতা লাভ প্রভৃতি সকাম কর্মকেই জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলে মনে করে। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ এবং ঐশ্বর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তারা বলে যে, তার ঊর্ধ্বে আর কিছুই নেই।"

অন্যদিকে, বৈদিক শাস্ত্রের কোনও কোনও অংশে বদ্ধ জীবের জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির অনুকূলেই বিশেষ বিধান দেওয়া হয়েছে, এবং সেই সঙ্গেই তাকে ক্রমশ বৈদিক অনুশাসনগুলি আত্মস্থ করবারও নির্দেশ রয়েছে। বৈদিকশাস্ত্রের যে সকল অংশে বিধিনিয়ম অনুসারে ইন্দ্রিয় উপভোগের জন্য সকাম কর্মবিধি নির্দেশিত হয়েছে, সেইগুলি তো অবশ্যই বিপজ্জনক, কারণ যে সমস্ত জীব ঐ ধরনের কার্যকলাপে প্রবৃত্ত হয়, তারা অচিরেই তাদের কাছে সহজলভ্য জড়জাগতিক ভোগতৃপ্তির আবর্তে অনায়াসেই জড়িত হয়ে পড়ে এবং তার ফলে বেদশাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য সাধনে অবহেলা করতে থাকে।

পরম পুরুষোত্তম ভগবানের নিত্য সেবকরূপে নিয়োজিত থাকার অনুকূলে জীবমাত্রেই তার যে অকৃত্রিম শুদ্ধ চেতনা সত্তায় পুনরধিষ্ঠিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন, সেই মর্যাদায় তাকে উত্তীর্ণ করাই সমগ্র বৈদিক শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য। শ্রীভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগের মাধ্যমে, জীবমাত্রেই শ্রীভগবানের নিজধামে তাঁর দিব্য সান্নিধ্যলাভের মাধ্যমে অনন্ত চিন্ময় সুখ উপভোগ করতে পারে। অতএব, কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনে অগ্রসর হওয়ার জন্য বাস্তবিকই অভিলাষী মানুষকে অবশ্যই বিশেষ মনোযোগ সহকারে বৈদিক শাস্ত্র শ্রবণ করতে হবে, যে-শাস্ত্রে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির বিষয় বলা হয়েছে। কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলনে বিশেষভাবে সমুন্নত মানুষদের কাছেই তা শ্রবণ করা উচিত এবং ভোগ প্রবৃত্তির জড়জাগতিক বাসনা উদ্দীপিত করতে পারে, এমন ব্যাখ্যা পরিহার করে চলতে হবে।

যখন ক্ষুদ্র জীব অবশেষে এই জগতের অনিত্য পরিবেশ এবং ভগবান ত্রিবিক্রম শ্রীকৃষ্ণের দিব্য ক্রিয়াকলাপের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করতে সক্ষম হয়, তখন সে শ্রীভগবানের সেবায় ভক্তিভরে আত্মসমর্পণ করে এবং তার অন্তর থেকে জড় অস্তিত্বের অন্ধকারাচ্ছন্ন আবরণ অপসৃত হয়, যার ফলে পাপ ও পুণ্য নামে দু'ধরনের ক্রিয়াকর্ম উপভোগের উপযোগী ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির অভিলাষ আর সে করে না। পরোক্ষভাবে, এই জগতের মাঝে মানুষকে কখনও পাপী কিংবা পুণ্যবান বলে বিবেচনা করা হলেও, জড়জাগতিক পরিবেশে পাপ এবং পুণ্য দু'ধরনের কাজই মানুষের আপন সুখভোগের জন্যই সাধিত হয়ে থাকে। কেউ যদি বুঝতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ বিধান করাই তার সুখের ভিত্তিস্বরূপ, তা হলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তেমন ভাগ্যবান জীবকে তাঁর নিজধাম গোলোক বৃন্দাবনে ফিরিয়ে নিয়ে চলে যান।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতে, শ্রীভগবান তাঁর লীলাকথা শ্রবণের সুযোগ নিষ্ঠাবান জীবকে করে দেন। ভক্ত ঐ ধরনের লীলাকথা বর্ণনার প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত আকর্ষণের মাধ্যমে উন্নীত হলে, এই জগতের মাঝে শ্রীভগবান তাঁর চিন্ময় দিব্য লীলাবিস্তার যেভাবে হতে থাকে, সেই সব কিছুর মাঝেই ভক্তকে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য সুযোগ অর্পণ করেন। কোনও একটি বিশেষ ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে শ্রীভগবানের লীলাবিস্তারে অংশগ্রহণের মাধ্যমে, জীব এই জড় জগৎ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, এবং তারই পরিণামে শ্রীভগবান তাকে চিদাকাশে তাঁর নিজ ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যান।

নির্বোধেরা শ্রীভগবানের প্রদত্ত এই অমূল্য কৃপার মর্ম উপলব্ধি করতে পারে না, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই ধরনের বুদ্ধিহীন মানুষদের কল্যাণার্থে মিথ্যা ভোগ উপভোগের এই অনিত্য জগতের মাঝে তাদের নিমজ্জিত হয়ে যাওয়ার সঙ্কট থেকে রক্ষার জন্য সক্রিয় হয়ে থাকেন। শ্রীভগবান স্বয়ং তাঁর নিজের সর্বোত্তম চিন্ময় রূপ সৌন্দর্য, তাঁর দিব্য বাক্য সুধা এবং অপ্রাকৃত লীলাবিস্তারের মাধ্যমে এই কল্যাণকার্য সম্পন্ন করতে থাকেন।

শ্রীল জীব গোস্বামী ব্যাখ্যা করেছেন যে, *তমোহনয়া তরিষ্যন্তি* শব্দগুলির দ্বারা বোঝায়—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাঁচ হাজার বছর আগে আবির্ভূত হলেও, শ্রীভগবানের লীলাপ্রসঙ্গ, রূপবৈচিত্র্য এবং কথামৃত যারা শ্রবণ ও কীর্তনের মাধ্যমে আস্বাদন করে থাকে, তারাও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িক যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে এই সকল অভিজ্ঞতা অর্জনের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, তাঁদেরই মতো সমান সুফল ভোগ করবে। পরোক্ষভাবে বলা যায়, জড়জাগতিক অস্তিত্বের অন্ধকার উত্তীর্ণ হয়ে তেমন মানুষ ভগবদ্ধাম লাভ করবে। এইভাবে শ্রীল জীব গোস্বামী সিদ্ধান্ত করেছেন

যে, সমস্ত জীবের পক্ষেই তেমন সমুন্নত মহান লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব হলে, তা নিশ্চয়ই যাদবদেরও অর্পণ করা যেত, কারণ তাঁরাও শ্রীভগবানের একান্ত পার্ষদ ছিলেন।

এই শ্লোকটিতে বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণকে যারা দর্শন করত, তাদের সকলেরই দৃষ্টি তিনি হরণ করে নিতেন তাঁর রূপ-মাধুর্যের মাধ্যমে। শ্রীকৃষ্ণের বাক্‌ভঙ্গী এমনই মাধুর্যময় হত যাতে তাঁর কথা শুনে সকলেই বাক্যহারা হয়ে পড়ত। যারা কথা বলতে পারে না, তারা যেহেতু সাধারণত বধিরও হয়ে যায়, তাই শ্রীভগবানের কথা শুনলেও তারা ভগবৎ-কথা ছাড়া অন্য কোনও কথা শোনবার আগ্রহ হারিয়ে ফেলত। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পদক্ষেপের সৌন্দর্যে মাধুর্য বিকাশের মাধ্যমে জড়জাগতিক কর্মকাণ্ডে ব্যাপৃত সকল মানুষেরই কর্মচাঞ্চল্য যেন ম্লান করে দিতেন। তাই এইভাবেই এই জগতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর আবির্ভাবের মাধ্যমে মানবজাতির সকল চেতনা যেন অপহরণ করে নিয়েছিলেন।

অন্যভাবে বলতে গেলে, তিনি মানুষকে অন্ধ, খঞ্জ, বধির, উন্মাদ, এবং অন্য নানা প্রকারে যেন অকর্মণ্য করে দিতেন। তাই শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর প্রশ্ন করেন, "তিনি যেহেতু মানুষের সর্বস্ব অপহরণ করে নেন, তবু তাকে কে আর কৃপাময় বলবে? বরং তিনি নিতান্তই এক তস্কর।" এইভাবেই তিনি পরোক্ষভাবে শ্রীভগবানের সৌন্দর্যের বিপুল প্রশংসা করেছেন। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও ব্যাখ্যা করেছেন যে, যদিও আসুরিক মানুষেরা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হলে তিনি তাদের নিধন করে মুক্তি প্রদান করেন, তা হলেও তিনি তাদের শুদ্ধ ভগবৎ প্রেম প্রদান করেন এবং তাঁর আপন রূপ মাধুর্যের সমুদ্রে যেন নিমজ্জিত করে রাখেন। তাই নির্বিচারে দাক্ষিণ্য বিতরণ করে যে মানুষ, শ্রীকৃষ্ণ তেমন নন। আর শ্রীকৃষ্ণ এমনই কৃপাময় যে, তিনি কেবল জগদ্বাসীদেরই মহত্তম কৃপা প্রদান করে থাকেন, তাই নয়, তিনি ব্যাসদেবের মতো মহর্ষিদেরও এমন ক্ষমতা প্রদান করেন, যার ফলে তাঁর লীলাবৃত্তান্ত মনোরম কাব্যগাথায় তাঁরা বর্ণনা করতে পারেন। এইভাবে তাই পৃথিবীর বুকে ভবিষ্যতে মানুষেরা জন্ম নিয়ে সেই সকল ভগবৎ-মহিমারাজি, যা সুদৃঢ় তরণীর সঙ্গে তুলনীয়, তারই ভরসায় জন্ম এবং মৃত্যুর বারিধি পাড়ি দিতে অনায়াসেই সক্ষম হতে পারবে। বাস্তবিকই, কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের কৃপায় শ্রীমদ্ভাগবতের ভক্তিবেদান্ত ভাবস্বচ্ছ তাৎপর্যগুলির মাধ্যমে অনাগত মানুষদের প্রতিও কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য আমরা যারা এখন আস্বাদন তথা উপভোগ করছি, তারা ভাগ্যবান।

'অমরকোষ' অভিধান থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও উল্লেখ করেছেন, *পদং ব্যবসিতত্রাণস্থানলক্ষ্যাঙ্ঘ্রিবস্তুষু*—*পদং* শব্দটির সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হল 'যা অধিষ্ঠিত হয়েছে', 'অনুগ্রহপ্রাপ্তির আশ্রয়', 'সৌভাগ্য', 'চরণ', অথবা 'বস্তু'। তাই তিনি *পদম্* শব্দটির অনুবাদে *ব্যবসিত* বোঝাতেও চেয়েছেন, অর্থাৎ 'যা অধিষ্ঠিত হয়েছে'।

পরোক্ষভাবে বলতে গেলে, *অগাৎ স্বং পদম্ ঈশ্বরঃ* বিবৃতিটি থেকে বোঝা যায় শ্রীকৃষ্ণ শুধুমাত্র তাঁর নিজধামে ফিরেই যাননি, তিনি তাঁর সুদৃঢ় অভিলাষ সেইভাবে সম্যক্‌রূপে রূপায়িত করেও ছিলেন। যদি আমরা বলি যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিত্যধামে প্রত্যাবর্তন করে গেলেন, তাহলে আমরা প্রতিপন্ন করছি যেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ধাম থেকে অনুপস্থিত হয়ে এখানে ছিলেন এবং এখন ফিরে যাচ্ছিলেন।

এই কারণেই, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর 'নিজধামে ফিরে গেলেন' বলতে সাধারণভাবে যা বোঝায়, সেইভাবে বলা ভুল। *ব্রহ্মসংহিতা* অনুসারে পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চিদাকাশে তাঁর নিত্যধামে সর্বদাই অধিষ্ঠিত রয়েছেন। তবু তাঁর অহৈতুকী কৃপার মাধ্যমে জড় জগতের মাঝেও বিভিন্ন সময়ান্তরে নিজেকে প্রতিভাত করে থাকেন। তাই, অন্যভাবে বলা চলে, শ্রীভগবান সর্বব্যাপী। এমন কি, তিনি যখন আমাদের সামনে উপস্থিত থাকেন, তখনও একই সময়ে তাঁর নিজধামে তিনি বিরাজিত থাকেন।

পরমাত্মার মতো সাধারণ জীবাত্মা সর্বব্যাপী অধিষ্ঠিত থাকে না, তাই জীব যখন জড় জগতে উপস্থিত থাকে, তখন চিন্ময় জগৎ থেকে সে অনুপস্থিত হয়ে থাকে। বাস্তবিকই, চিন্ময় জগৎ, অর্থাৎ বৈকুণ্ঠধাম থেকে সেই অনুপস্থিতির ফলেই আমরা দুঃখভোগ করছি।

পরম পুরুষোত্তম ভগবান অবশ্য সর্বব্যাপী বিরাজিত থাকেন, এবং তাই শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *অগাৎ স্বং পদম্* শব্দগুলির অনুবাদে বোঝাতে চেয়েছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যথার্থই যা অভিলাষ করেছিলেন, তাই প্রতিপন্ন করেছিলেন। শ্রীভগবান সর্বত্র বিরাজমান এবং স্বরাট তথা স্বয়ংসম্পূর্ণ বলেই তাঁর যথার্থ অভিলাষাদি পূরণ করতে সক্ষম হন। সাধারণ জড়জাগতিক ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে এই জগতে তাঁর আবির্ভাব এবং অন্তর্ধানের বিষয়টি কখনই তুলনা করা উচিত নয়।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *শ্রীমদ্ভাগবতের* তৃতীয় স্কন্ধের (৩/২/৭) সূচনা থেকে শ্রীউদ্ধবের একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, যেখানে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান বিষয়টিকে উদ্ধব সূর্যের অস্তমিত হওয়ার সাথে তুলনা করেছেন। এই শ্লোকটির তাৎপর্য নির্ণয় প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন, "শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সূর্যের তুলনা খুবই

যথার্থ। সূর্য যখনই অস্ত যায়, তখন আপনা হতেই অন্ধকার নেমে আসে। কিন্তু সাধারণ মানুষ অন্ধকারের যে অভিজ্ঞতা লাভ করে, তার ফলে সূর্যোদয় কিংবা সূর্যাস্তের কোনও সময়েই স্বয়ং সূর্যের কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরও আবির্ভাব এবং তিরোভাব অবিকল সূর্যেরই মতো। অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডে তিনি আবির্ভূত এবং তিরোহিত হয়ে থাকেন, এবং যতদিন তিনি কোনও বিশেষ একটি ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত থাকেন, ততদিন সেই ব্রহ্মাণ্ডে সামগ্রিকভাবে অপ্রাকৃত জ্যোতি বিরাজ করতে থাকে, কিন্তু যে ব্রহ্মাণ্ড থেকে তিনি অন্তর্হিত হন, তা অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যায়। তবে, তাঁর লীলাবৈচিত্র্য চিরস্থায়ী। শ্রীভগবান কোনও না কোনও ব্রহ্মাণ্ডে সর্বদাই বিরাজ করছেন, ঠিক যেমন সূর্য পূর্ব কিংবা পশ্চিম গোলার্ধে বিরাজিত রয়েছে। সূর্য সর্বদাই ভারতে কিংবা আমেরিকায় উপস্থিত হয়ে থাকে, তবে সূর্য যখন ভারতে থাকে, আমেরিকার দেশে তখন অন্ধকার বিরাজ করে, আর সূর্য যখন আমেরিকায় থাকে, ভারতের গোলার্ধ তখন থাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন।"

শ্রীল জীব গোস্বামী একাদশ স্কন্ধের শেষাংশ থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন, যা থেকে আরও সুস্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হয় যে, শ্রীভগবানের ধামটি স্বয়ং শ্রীভগবানেরই মতো নিত্যধর্মী—"হে মহারাজ, শ্রীভগবানের নিজধাম যা শ্রীভগবান পরিত্যাগ করেছিলেন, সেই দ্বারকাধামটিকে সমুদ্র অনতিবিলম্বে গ্রাস করে নিল। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীমধুসূদন দ্বারকাধামে নিত্য বিরাজমান রয়েছেন, যে-ধামটির কথা শুধুমাত্র স্মরণ করলেই সর্বপ্রকার অমঙ্গল দূর হয়ে যায়। এই ধাম পুণ্যভূমিগুলির মধ্যে সর্বোত্তম পুণ্যস্থান।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/৩১/২৩-২৪)।

যেভাবে মনে হয় রাত্রি এসে সূর্যকে গ্রাস করে নিল, সেইভাবেই শ্রীকৃষ্ণ কিংবা তাঁর ধাম অথবা তাঁর বংশ লোপ পেল বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আকাশে যেমন সূর্য সর্বদাই বিরাজমান, তেমনই বাস্তবিকই শ্রীভগবান এবং তাঁর সমস্ত আনুষঙ্গিক পরিকরাদি, এমন কি তাঁর নিজধাম এবং বংশপরম্পরা সবই নিত্য বিরাজমান থাকে। ঠিক এইভাবেই শ্রীল প্রভুপাদ এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "যেভাবে সূর্য সকালে ওঠে এবং ক্রমশ মধ্যগগনে উঠে যায় আর তারপরে আবার একটি গোলার্ধে অস্তমিত হয়ে একই সঙ্গে অন্য গোলার্ধে উদিত হয়, তেমনই একটি ব্রহ্মাণ্ডে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান এবং অন্য একটি ব্রহ্মাণ্ডে তাঁর বিভিন্ন লীলাবৈচিত্র্য একই সঙ্গে শুরু হয়ে যায়। যখনই একটি লীলাপ্রকাশ এখানে সমাপ্ত হয়, তখনই অন্য ব্রহ্মাণ্ডে তার অভিপ্রকাশ ঘটে। আর এইভাবেই তাঁর নিত্যলীলা তথা চিরন্তন ক্রীড়া অভিলাষ অবিরামভাবে হয়ে চলেছে।"

শ্লোক ৮

শ্রীরাজোবাচ

ব্রহ্মণ্যানাং বদান্যানাং নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনাম্ ।
বিপ্রশাপঃ কথমভূদ্বৃষ্ণীনাং কৃষ্ণচেতসাম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীরাজা উবাচ—রাজা বললেন; **ব্রহ্মণ্যানাম্**—ব্রাহ্মণদের প্রতি যাঁরা শ্রদ্ধাশীল; **বদান্যানাম্**—দানশীল; **নিত্যম্**—সর্বদা; **বৃদ্ধ-উপসেবিনাম্**—বৃদ্ধজনের সেবারত; **বিপ্রশাপঃ**—ব্রহ্মশাপ; **কথম্**—কি জন্য; **অভূৎ**—সংঘটিত হয়েছিল; **বৃষ্ণীনাম্**—যাদবদের; **কৃষ্ণচেতসাম্**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ জানতে চেয়েছিলেন—হে মুনিবর! ব্রাহ্মণভক্ত, বদান্য, বৃদ্ধজনসেবারত, কৃষ্ণগতচিত্ত যাদবদের উপরেও ব্রহ্মশাপ কি জন্য সংঘটিত হয়েছিল, তা অনুগ্রহ করে বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণশ্রেণীর প্রতি যে সব মানুষ দয়া-দাক্ষিণ্যহীন, এবং যারা জ্যেষ্ঠ, সম্মানিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সেবাকার্যে অনীহা প্রকাশ করে, তাদের প্রতি ব্রাহ্মণেরা সাধারণত কুপিত হয়ে থাকেন। বৃষ্ণিবংশের সকলে অবশ্য তেমন ভাবাপন্ন ছিলেন না, এবং তাই তাঁরা এখানে মহারাজ পরীক্ষিৎ কর্তৃক *ব্রহ্মণ্যানাং*, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির নিষ্ঠাবান অনুসারী বলেই বর্ণিত হয়েছেন। তা ছাড়া, ব্রাহ্মণেরা কুপিত হলেও, শ্রীকৃষ্ণের আপন পরিবারবর্গের সদস্যদের প্রতি তাঁরা অভিশাপ দেবেন কেন? যেহেতু ব্রাহ্মণেরা যথেষ্ট শিক্ষাপ্রাপ্ত, তাই তাঁদের জানা উচিত ছিল যে, পরমেশ্বর ভগবানের অন্তরঙ্গ পার্ষদবর্গের বিরুদ্ধাচরণ করা অন্যায়। যদুবংশকে এখানে বিশেষভাবেই *বৃষ্ণিনাম্* এবং *কৃষ্ণচেতসাম্* রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই, বলতে গেলে, তাঁরা ছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই আপনজন, এবং তাঁরা সকল সময়ে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় ভাবিত হয়ে থাকতেন। সুতরাং, যদিও কখনও কোনওভাবে ব্রাহ্মণেরা তাঁদের অভিশাপ দিলেও, কিভাবে সেই অভিশাপ কার্যকরী হতে পারে? এইগুলি ছিল পরীক্ষিৎ মহারাজের প্রশ্ন।

যদিও এই শ্লোকটিতে বৃষ্ণীবংশীয়দের *কৃষ্ণচেতসাম্* অর্থাৎ কৃষ্ণগতচিত্ত রূপে বর্ণনা করা হয়েছে, তা হলেও সুস্পষ্টভাবেই প্রতিভাত হয়েছে যে, ব্রাহ্মণেরা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠুন এবং যদুবংশকে অভিশাপ দিন, শ্রীকৃষ্ণ তা অভিলাষ করেছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান পৃথিবী থেকে তাঁর নিজ বংশধারা অপসারণ করতেই ইচ্ছা করেন এবং তাই শ্রীকৃষ্ণেরই আপন পরিবারবর্গের তরুণ বালকেরা অন্যান্য বেদনাদায়ক আচরণ প্রদর্শন করেছিল।

এই ঘটনা থেকে বোঝা দরকার যে, কোনও মানুষ যখন বিষ্ণুভক্তদের প্রতি ঈর্ষাদ্বন্দ্ব এবং তুচ্ছতাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে, তখন তার ব্রহ্মণ্যতা, অর্থাৎ সুমহান পারমার্থিক গুণবৈশিষ্ট্যাদি সহ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তার শ্রদ্ধা-ভক্তি সবই বিনষ্ট হয়ে যায়। পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তবৃন্দের প্রতি সদাচার বিঘ্নিত হলে, শ্রীভগবান তাঁর আপন আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবর্গের প্রতিও বিরক্ত হন এবং তাই তাঁর ভক্তদের বিরুদ্ধাচরণ যারা করে, তাদের ধ্বংস করবার আয়োজন তিনিই করে থাকেন। যদি নির্বোধ কিছু মানুষ শ্রীকৃষ্ণের আপন পরিবারবর্গের স্বজন হওয়ার সুযোগ নিয়ে বৈষ্ণবজনের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ প্রকাশ করে, তা হলে সেই সমস্ত বিরুদ্ধবাদী মানুষদের কখনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বংশজাত সন্তানাদি বলে যথার্থভাবে অভিহিত করা চলে না। পরমেশ্বর ভগবানের সমভাবাপন্ন মানসিকতার সেটাই চরম অভিপ্রকাশ।

শ্লোক ৯

যন্নিমিত্তঃ স বৈ শাপো যাদৃশো দ্বিজসত্তম ।
কথমেকাত্মনাং ভেদ এতৎ সর্বং বদস্ব মে ॥ ৯ ॥

যৎ-নিমিত্তঃ—যে কারণে উদ্ভূত; **সঃ**—সেই; **বৈ**—অবশ্য; **শাপঃ**—অভিশাপ; **যাদৃশঃ**—যে ধরনের; **দ্বিজসত্তম্**—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ; **কথম্**—কেমনভাবে; **এক-আত্মনাম্**—যারা শ্রীকৃষ্ণেরই আত্মার অংশীদার; **ভেদঃ**—মতভেদ; **এতৎ**—এই; **সর্বম্**—সকল; **বদস্ব**—কৃপা করে বর্ণনা করুন; **মে**—আমাকে।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ আরও জানতে চাইলেন—এই অভিশাপের উদ্দেশ্য কী ছিল? হে দ্বিজবর, এই অভিশাপে কী বলা হয়েছিল? আর, জীবনের একই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য যাদবেরা একত্রিত হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে ঐ ধরনের মতভেদ সৃষ্টি হতে পেরেছিল? কৃপা করে আমাকে এই সব বিষয়ে বলুন।

তাৎপর্য

একাত্মনাং মানে যাদবেরা সকলেই একই ভাবধারার অংশীদার ছিল অর্থাৎ পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণই ছিলেন তাদের জীবনের লক্ষ্য। তাই, যদুবংশের সদস্যদের মধ্যে এমন এক সর্বনাশা কলহের কোনও আপাতগ্রাহ্য হেতু পরীক্ষিৎ মহারাজ খুঁজে পাননি বলেই তিনি তার যথার্থ কারণ জানতে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন।

শ্লোক ১০

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ

বিভ্রদ্বপুঃ সকলসুন্দরসন্নিবেশং
কর্মাচরন্ ভুবি সুমঙ্গলমাপ্তকামঃ ।
আস্থায় ধাম রমমাণ উদারকীর্তিঃ
সংহর্তুমৈচ্ছত কুলং স্থিতকৃত্যশেষঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীবাদরায়ণিঃ—বাদরায়ণ পুত্র শ্রীশুকদেব গোস্বামী; **উবাচ**—বললেন; **বিভ্রৎ**—ধারণ করে; **বপুঃ**—চিন্ময় দেহ; **সকল**—সকলের; **সুন্দর**—সুন্দর বস্তু; **সন্নিবেশম্**—সন্নিবেশ; **কর্ম**—কাজ; **আচরন্**—অনুষ্ঠান; **ভুবি**—ভূমণ্ডলে; **সুমঙ্গলম্**—অতি মঙ্গলময়; **আপ্তকামঃ**—শ্রীভগবানের সকল অভিলাষে পরিতৃপ্ত হয়ে; **আস্থায়**—অধিষ্ঠিত হয়ে; **ধাম**—তাঁর ধাম (দ্বারকায়); **রমমাণঃ**—জীবনযাত্রা উপভোগে; **উদার-কীর্তিঃ**—যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বহুফলপ্রদায়ী কীর্তিরাজি; **সংহর্তুম্**—বিনাশের জন্য; **ঐচ্ছত**—তিনি ইচ্ছা করেন; **কুলম্**—তাঁর নিজবংশ; **স্থিত**—অবস্থিত; **কৃত্য**—তাঁর কর্তব্য; **শেষঃ**—কিছু অবশিষ্ট।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—শ্রীভগবান নিখিলবিশ্বের সমস্ত কিছু সুন্দর বিষয়বস্তুর সমাবেশাশ্রিত তাঁর রমণীয় দেহবিগ্রহ ধারণ করে পৃথিবীতে অতীব শ্রেষ্ঠ সুমঙ্গলময় ক্রিয়াকর্ম নিষ্ঠাভরে সম্পন্ন করে থাকা সত্ত্বেও এবং তাঁর সকল অভিলাষ পূরণ হলেও, তাঁর ধামে অবস্থানকালে এবং জীবনধারা উপভোগ করতে থাকলেও, শ্রীভগবান, যাঁর মহিমা স্বতঃ উদ্ভাসিত, এবার তাঁর কর্তব্যকর্ম তখনও কিছুটা অবশিষ্ট আছে বিবেচনা করে তাঁর নিজবংশ সংহারের সঙ্কল্প করেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে পরীক্ষিৎ মহারাজের একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে—কিভাবে যাদব বংশের শক্তিমান মানুষদের ব্রাহ্মণেরা অভিশাপ দিতে পারল এবং তার ফলে ভ্রাতৃনিধনকারী এক মহাযুদ্ধে তারা নিজেদের স্ববংশে নিধন করতে পেরেছিল। *সংহর্তুমৈচ্ছত কুলম্* শব্দগুলির মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর নিজবংশ সংহারের সঙ্কল্প করেন, এবং তাই তাঁর প্রতিভূস্বরূপ ব্রাহ্মণদের নিয়োগ করেছিলেন।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ সকল জগদ্বাসীর সামনেই তাঁর নিজ শ্রীবিগ্রহরূপের অপরিসীম সৌন্দর্য এবং শৌর্য অভিব্যক্ত করে থাকলেও,

তিনি তাঁর অবতার রূপগুলির মাধ্যমে বহু দৈত্যদানবকে নিহত করে তাঁর ভক্ত সমাজকে রক্ষা করেন এবং সৎ ধর্ম পুনরায় উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে তাঁর লীলা সর্বার্থসাধক করেছিলেন। এইভাবে, অসুরকুল বিনষ্ট করে ভক্তদের সুরক্ষিত করার মাধ্যমে ধর্ম সংস্থাপনের কাজে তাঁর উদ্দেশ্য সর্বার্থসাধক এবং সুসম্পূর্ণ হয়েছিল। তাই যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে, এবার তাঁর উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ হয়েছে, সবকিছু সুসম্পন্ন হয়েছে, তখন তিনি বৃষ্ণিবংশের সকলকে নিয়ে তাঁর অপ্রাকৃত পরম ধামে প্রত্যাবর্তনের অভিলাষ করেন। তাই এই কারণে ব্রাহ্মণদের অভিশাপে যদুবংশের সমাপ্তির আয়োজন শ্রীভগবান নিজেই করেছিলেন।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীর মতে, *আপ্তকর্মঃ* মানে শ্রীকৃষ্ণ আপনার ক্রিয়াকর্মে সর্বদাই আত্মতৃপ্ত হয়ে থাকেন, এবং তাঁর অপ্রাকৃত লীলাবৈচিত্র্য সমাধার উদ্দেশ্যে তিনটি বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে তাঁর নিজবংশ ধ্বংস করার আয়োজনের জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন—যথা, তাঁকে সহায়তা করবার জন্য যে সকল দেবতা যদুবংশের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের স্বর্গলোকে পুনরধিষ্ঠিত করা; বৈকুণ্ঠ, শ্বেতদ্বীপ এবং বদ্রিকাশ্রমের ধামগুলিতে তাঁর বিষ্ণুরূপের পুনরধিষ্ঠান করা এবং তাঁর নিত্য পার্ষদবর্গ নিয়ে জড়জগতের দৃষ্টিপথ থেকে নিজেকে পরিহার করে নেওয়া।

এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর যদুবংশের ধ্বংস সম্পর্কে কতকগুলি মূল্যবান মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন যে, বহু মানুষ যাদের ধার্মিক বলে পরিচিতি আছে, তারা পবিত্র নাম কীর্তন প্রচারের দ্বিতীয় অপরাধটি করে থাকে, অর্থাৎ *বিষ্ণৌ সর্বেশ্বরেশে তদিতর সমধীঃ*—অন্য জীবকে সকল ঈশ্বরেরও ঈশ্বর পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণুর সমমর্যাদাসম্পন্ন মনে করে। মায়াবাদী দর্শনতত্ত্বের নিরাকার ভাবতত্ত্বে যে জন আবিষ্ট হয়েছে, সে ভ্রান্তিবশত চিন্তা করে যে, শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা জড়জাগতিক শক্তি ও তাঁর অন্তরঙ্গা চিন্ময় শক্তি-সত্তারই সমান। এইভাবে, শ্রীকৃষ্ণকে মায়ার অন্য এক অঙ্গ মনে করে মানুষ পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে অহেতুক তুলনা করে থাকে। এই ভাবধারা খুবই দুর্ভাগ্যজনক চিন্তার প্রতিফলন, কারণ শ্রীভগবানের বাস্তবিকই কিরূপ সত্তা, তা উপলব্ধির ক্ষেত্রে এমন মানসিকতা অবশ্যই বিষম বিপর্যয় সৃষ্টি করে।

জীবনতত্ত্বের এই মায়াময় ভাবধারায় যে সব মানুষ আকৃষ্ট হয়, তারা তো নিঃসন্দেহেই যদুবংশের সদস্যদের সকল বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের সমকক্ষ মনে করে এবং শ্রীকৃষ্ণের ভবিষ্যৎ বংশধরদেরও স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের সমকক্ষ বিচারে আরাধনা করে থাকে। তাই পৃথিবীতে যদুবংশের ধারাবাহিক বিদ্যমান থাকার ফলে অবশ্যই পারমার্থিক উপলব্ধির পথে বিপুল অন্তরায় সৃষ্টি হত এবং তা পৃথিবীর মহাভার

হয়ে উঠত। শ্রীবিষ্ণুর পরিবারবর্গের সঙ্গে শ্রীবিষ্ণুর সমমর্যাদামূলক অপরাধের এই বিপত্তি থেকে পৃথিবীকে রক্ষার উদ্দেশ্যে শ্রীভগবান, যদুবংশের বিনাশ সাধনে মনস্থির করেন।

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই তাঁর ভক্তদের প্রতি স্নেহশীল, কিন্তু যখনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পারিবারিক বংশধরগণ তাঁর প্রতি শত্রুভাবাপন্ন বা অমনোযোগী হয়ে ওঠে, তাঁর শুদ্ধভক্তদের প্রতি প্রীতিভাবাপন্ন হয় না কিংবা তাঁর সেবকদের সঙ্গে মিত্রতা রক্ষা করে না, তখন শ্রীভগবানের ঐ সমস্ত তথাকথিত পারিবারিক সদস্যবৃন্দ তাঁর অভিলাষ পূরণে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে থাকে। বাস্তবিকই, ঐ ধরনের বিরুদ্ধবাদী মানুষদের প্রতি পূজা আরাধনা নিবেদনের মাধ্যমে অজ্ঞ মানুষেরা তাদের শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদবর্গ মনে করে পূজা আরাধনা করতে থাকবে।

যেমন, কংসকে শ্রীকৃষ্ণের মামা বলে মনে করা এবং সেই সূত্রে তাকে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বস্ত সেবকরূপে মান্য করা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত হতে পারত। এমন ভ্রান্ত ধারণার ফলে, মন্দ চরিত্রের যেসব মানুষ শ্রীভগবানের বিরুদ্ধাচরণ করে থাকে, তারা শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গ পার্ষদবর্গরূপে মান্যতা অর্জন করতে পারে, এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিরাগভাজন মানুষদেরও যেন তাঁর নিজ পরিবারবর্গেরই অনুগত পোষ্যজন বলে মনে হত। যদুবংশ ধ্বংসের উদ্দেশ্যই ছিল এই যে, মায়াবাদী যেসব মানুষ মিথ্যা যুক্তিবাদের মাধ্যমে সবকিছুকেই সকল বিষয়ে অভিন্ন বলে মনে করে এবং তাই যারা অহেতুক যুক্তি প্রদর্শন করে যে, শ্রীকৃষ্ণের ভক্তমণ্ডলীর প্রতি বৈরীভাবাপন্ন লোকেরাও শ্রীভগবানের পরিবারভুক্ত অন্তরঙ্গ সদস্যবর্গ হতে পারে, তাদের সমূলে বিনাশ করা।

শ্লোক ১১-১২

কর্মাণি পুণ্যনিবহানি সুমঙ্গলানি
গায়জ্জগৎ কলিমলাপহরাণি কৃত্বা ।
কালাত্মনা নিবসতা যদুদেবগেহে
পিণ্ডারকং সমগমন্ মুনয়ো নিসৃষ্টাঃ ॥ ১১ ॥
বিশ্বামিত্রোঽসিতঃ কণ্বো দুর্বাসা ভৃগুরঙ্গিরা ।
কশ্যপো বামদেবোঽত্রির্বশিষ্ঠো নারদাদয়ঃ ॥ ১২ ॥

কর্মাণি—ফলাশ্রিত যাগযজ্ঞ কর্মাদি; পুণ্য—সৎকার্য; নিবহানি—যা প্রদান করে; সু-মঙ্গলানি—অতি মঙ্গলময়; গায়ৎ—যে বিষয়ে যশোগান কীর্তন; জগৎ—সমগ্র পৃথিবীর জন্য; কলি—বর্তমান অধঃপতিত যুগে; মল—পাপাদি; অপহরাণি—

অপহরণ করে; **কৃত্বা**—অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে; **কাল-আত্মনা**—মহাকালের স্বয়ং স্বরূপ; **নিবসতা**—অবস্থানকালে; **যদুদেব**—যদুবংশের প্রভু (রাজা বসুদেব); **গেহে**—গৃহে; **পিণ্ডারকম্**—পিণ্ডারক নামে তীর্থ ক্ষেত্রে; **সমগমন্**—তাঁরা গেলেন; **মুনয়ঃ**—মুনিগণ; **নিসৃষ্টাঃ**—প্রেরিত; **বিশ্বামিত্রঃ অসিতঃ কণ্বঃ**—বিশ্বামিত্র, অসিত এবং কণ্ব মুনিবৃন্দ; **দুর্বাসাঃ ভৃগুঃ অঙ্গিরাঃ**—দুর্বাসা, ভৃগু এবং অঙ্গিরা; **কশ্যপঃ বামদেবঃ অত্রিঃ**—কশ্যপ, বামদেব এবং অত্রি; **বশিষ্ঠঃ নারদাদয়ঃ**—বশিষ্ঠ, নারদ এবং অন্যান্য সকলে।

অনুবাদ

বিশ্বামিত্র, অসিত, কণ্ব, দুর্বাসা, ভৃগু, অঙ্গিরা, কশ্যপ, বামদেব, অত্রি এবং বশিষ্ঠ, একদা শ্রীনারদমুনি এবং অন্যান্যদের সহযোগিতায়, ফলাশ্রয়ী কিছু যজ্ঞকর্মাদি অনুষ্ঠান করেন, কারণ এগুলির মাধ্যমে কল্যাণ লাভ হয় এবং পুণ্যফল অর্জন করা যায়। পরে, ঐগুলি কলিযুগের পাপাদি হরণ করে সার্থক জীবনধারা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পরিগণিত হত। ঋষিবর্গ যথাযথভাবে বিবিধ শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকর্ম অনুসারে যদুবংশের প্রধান বসুদেব তথা শ্রীকৃষ্ণের জনকের কল্যাণার্থে যজ্ঞাদি সম্পন্ন করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের গৃহে অবস্থানের পরে ঐ সকল যজ্ঞানুষ্ঠানাদির শেষে মুনিবর্গ বিদায় গ্রহণ করে তাঁরা পিণ্ডারকতীর্থে গমন করেন।

তাৎপর্য

শ্রীভগবানের অভিলাষে যদুবংশের বিরুদ্ধে যে ব্রহ্মশাপ উত্থিত হয়েছিল তার কাহিনী এই শ্লোকটিতে শ্রীশুকদেব গোস্বামী বর্ণনা শুরু করেছেন। শ্রীধর স্বামীর অভিমতে, অশ্বমেধ যজ্ঞের মতো কিছু ধর্মীয় যজ্ঞকর্মাদির ফলে পুণ্যকর্ম সঞ্চিত হয়ে থাকে। অন্য দিকে, কারও সন্তানাদি পরিচর্যার মতো ক্রিয়াকর্ম শুধুমাত্র বর্তমানকালেই তাৎক্ষণিক সুখতৃপ্তি প্রদান করে থাকে, অথচ প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ অনুষ্ঠিত ধর্মযজ্ঞাদির ফলে পাপময় কর্মফল বিদূরিত হয়ে যায়।

কিন্তু ১১শ শ্লোকে *কর্মাণি পুণ্যানিবহানি সুমঙ্গলানি গায়জ্জগৎ কলিমলাপহরাণি* শব্দগুলির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, ঐ সকল ধর্মযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান সকল দিক থেকেই পুণ্যময় ক্রিয়াকর্ম। ঐগুলি থেকে বিপুল পুণ্যফল ও মহা আনন্দ সৃষ্টি হয় এবং ঐগুলি এমনই ফলপ্রসূ যে, এই ধরনের যজ্ঞকর্মাদির মাহাত্ম্য শুধুমাত্র বর্ণনা করলেই কলিযুগের সকল পাপকর্মফলাদি থেকে মানুষ মুক্তিলাভ করবে।

এই ধরনের শুভফলপ্রদায়ী ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মাদি সম্পন্ন করার জন্য বসুদেবের গৃহে আহুত মুনি-ঋষিগণ যথাযথ পারিতোষিক সহকারে প্রীতিলাভ করেছিলেন এবং তারপরে শ্রীকৃষ্ণ গুজরাতের উপকূলে আরব সাগর থেকে প্রায় দু'মাইল দূরে অবস্থিত সন্নিকটস্থ এক পুণ্যস্থান পিণ্ডারকে তাঁদের প্রেরণ করেন। স্থানটির নাম এখনও পিণ্ডারক।

বিশেষ তাৎপর্যের বিষয় এই যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে *কালাত্মনা*, মহাকালের স্বরূপ, তথা পরমাত্মারূপে উল্লিখিত হয়েছেন। *ভগবদ্গীতার* একাদশ অধ্যায়ে পরম পুরুষোত্তম ভগবান অর্জুনের সমক্ষে আপনাকে মহাকাল স্বরূপ কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গণে আবির্ভূত হয়ে পৃথিবীর মহাভারস্বরূপ বিদ্যমান সমস্ত নৃপতিকুলের এবং তাদের সেনাবাহিনীর ধ্বংসসাধন করেন। তেমনই, *কালাত্মনা নিবসতা যদুদেবগেহে*—শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিতা বসুদেবের আলয়ে মহাকাল স্বরূপ অধিষ্ঠান করেন, যা থেকে বোঝা যায় যে, তাঁর অভিলাষ অনুসারে তাঁর নিজ বংশের ধ্বংস আগতপ্রায়।

শ্লোক ১৩-১৫

ক্রীড়ন্তস্তানুপব্রজ্য কুমারা যদুনন্দনাঃ ।
উপসংগৃহ্য পপ্রচ্ছুরবিনীতা বিনীতবৎ ॥ ১৩ ॥
তে বেষয়িত্বা স্ত্রীবেষৈঃ সাম্বং জাম্ববতীসুতম্ ।
এষা পৃচ্ছতি বো বিপ্রা অন্তর্বত্ন্যসিতেক্ষণা ॥ ১৪ ॥
প্রষ্টুং বিলজ্জতি সাক্ষাৎ প্রব্রূতামোঘদর্শনাঃ ।
প্রসোষ্যন্তী পুত্রকামা কিং স্বিৎ সঞ্জনয়িষ্যতি ॥ ১৫ ॥

ক্রীড়ন্তঃ—ক্রীড়ারত; **তান্**—তাঁরা (মুনিগণ); **উপব্রজ্য**—সমীপবর্তী হলেন; **কুমারাঃ**—কুমার বালকবৃন্দ; **যদুনন্দনাঃ**—যদুবংশের সন্তানগণ; **উপসংগৃহ্য**—মুনিগণের পাদস্পর্শ করে; **পপ্রচ্ছুঃ**—জিজ্ঞাসা করেন; **অবিনীতঃ**—উদ্ধতভাবে; **বিনীতবৎ**—নম্রভাবে; **তে**—তারা; **বেষয়িত্বা**—বেশভূষায়; **স্ত্রীবেষৈঃ**—স্ত্রীজনোচিত বস্ত্রাভরণে; **সাম্বং জাম্ববতী-সুতম্**—জাম্ববতীর পুত্র সাম্ব; **এষা**—এই মহিলা; **পৃচ্ছতি**—প্রশ্ন করছেন; **বঃ**—আপনারা; **বিপ্রাঃ**—হে জ্ঞানী ব্রাহ্মণগণ; **অন্তর্বত্নী**—অন্তঃসত্ত্বা; **অসিত-ঈক্ষণা**—সুনীল কটাক্ষ; **প্রষ্টুম্**—প্রশ্ন করতে; **বিলজ্জতী**—সলজ্জভাবে; **সাক্ষাৎ**—সরাসরি নিজে; **প্রব্রূত**—কৃপা করে বলুন; **অমোঘ-দর্শনাঃ**—হে অব্যর্থ-দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষগণ; **প্রসোষ্যন্তী**—আসন্ন প্রসবা; **পুত্রকামা**—পুত্রলাভেচ্ছু; **কিং স্বিৎ**—পুত্র না কন্যা?; **সঞ্জনয়িষ্যতি**—জন্ম দেবেন।

অনুবাদ

সেই পুণ্যভূমিতে, যদুবংশের কুমার বালকেরা জাম্ববতীর পুত্র সাম্বকে স্ত্রীবেশে সজ্জিত করে নিয়ে এসেছিল। সেখানে সমবেত মহান্ ঋষিবর্গের সামনে ক্রীড়াচ্ছলে উপস্থিত হয়ে উদ্ধতস্বভাব হলেও বালকেরা মুনিবর্গের পাদস্পর্শ করে কপট বিনয় সহকারে জিজ্ঞাসা করেছিল, "হে পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ, এই সুনীলনয়না

গর্ভবতী নারী আপনাদের কিছু প্রশ্ন করতে চান। তিনি স্বয়ং জিজ্ঞাসা করতে লজ্জিতা হচ্ছেন। তিনি আসন্নপ্রসবা এবং পুত্রসন্তান লাভে বিশেষভাবে ইচ্ছুক। যেহেতু আপনারা সকলেই অব্যর্থ দৃষ্টিসম্পন্ন মহামুনি, তাই কৃপা করে বলুন— ইনি পুত্র বা কন্যা কী প্রসব করবেন।"

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন—"নারদমুনি প্রমুখ ঋষিবর্গ ছিলেন সকলেই ব্রাহ্মণ এবং ভগবদ্ভক্ত, তাই তাঁদের প্রতি যদুকুমারদের দুর্বিনীত আচরণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রদর্শিত পন্থার বিরোধী হয়েছিল। তেমনই, প্রাকৃত সহজিয়ারা নিজেদের যদিও শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সখা বলে মনে করে, তবু ঐ ধরনের অভক্তদের বিনাশ সাধনে পরম কৃপাময় ভগবানের সিদ্ধান্ত অবশ্যই সম্পূর্ণ সঠিক। ঐ ধরনের ভণ্ড ছদ্মবেশীরা বাস্তবিকই শ্রীকৃষ্ণের সেবায় কখনও যথার্থভাবে মনঃসংযোগ করে না। যদুকুমারদের ভণ্ডামি আপাতদৃষ্টিতে 'নিতান্তই তুচ্ছ', কারণ সেই আচরণে বিন্দুমাত্র বিনয় প্রদর্শিত হয়নি। তাই শ্রীভগবানেরই পরিবারবর্গের সদস্যগণ দ্বারা শ্রীভগবানের ভক্তবৃন্দের প্রতি অত্যন্ত অপমানকর আচরণের ফলে এক মহা-অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল।"

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাবিহার পর্যায়ে যখন তাঁর নিজ জননী শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের প্রতি অপরাধ করেছিলেন, তখন এমনই এক ঘটনা ঘটেছিল। এক মহান বৈষ্ণবের প্রতি এই অপরাধের সুরাহা স্বয়ং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই করেছিলেন এবং তার দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁর উদার কৃপা প্রদর্শন করেন। যদুবংশ ধ্বংসের ক্ষেত্রেও শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবৃন্দের প্রতি তাঁর কৃপা প্রদর্শনের দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছিল।

ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিবিষয়ক জড়জাগতিক ব্যাপারে ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব এবং ঋষিবর্গ নির্বোধের মতো অজ্ঞ, এই বিশ্বাস নিয়ে যদু-কুমারেরা জাম্ববতীর পুত্র সাম্বকে একজন নারীর মতো সাজিয়ে মুনিমণ্ডলীকে বিভ্রান্ত করতে অপচেষ্টা করেছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই শিক্ষণীয় তত্ত্বটি উপস্থাপন করতে চেয়েছিলেন যে, তাঁর পার্ষদ সাম্বের দ্বারা মহান ভক্তদের প্রতি এই ধরনের অপরাধ যদুবংশের ধ্বংসের কারণ হবে তাঁরই নিজলীলা বিস্তারের অংশস্বরূপ।

অধুনা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের মধ্যেও ঠিক এই ধরনের অসদাচরণ প্রকটিত হয়েছে। কিছু লোক তাদের অনুগামীদের 'সখীভেক' তথা নারীর পোশাক ব্যবহারের অনুমোদন দিয়ে বিভ্রান্তিকর প্রক্রিয়ার সূচনা করেছে। এই প্রক্রিয়াটিকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এক ধরনের অপরাধমূলক আচরণ ব্যবস্থা বলেই গণ্য করতে হবে। বৈদিক শাস্ত্রসম্মত বিধিনিয়মানুসারে যে সব প্রকৃত বৈষ্ণব ভগবদ্ভক্তির ক্রিয়াকর্মে

নিষ্ঠাভরে আত্মনিয়োগ করে রয়েছেন, তাঁদের প্রতি অবশ্যই ঈর্ষান্বিত হওয়ার ফলে তাঁদের কৃষ্ণভক্তির আচরণ পদ্ধতিকে হাস্যাস্পদ এবং লঘুমর্যাদাসম্পন্ন করে তোলার জন্যই এমন আচরণের অবতারণা হয়েছে। তাই, শ্রীরূপ গোস্বামী বলেছেন—

শ্রুতিস্মৃতি পুরাণাদি পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা ।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে ॥

"যদি কেউ পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে তাঁর বিপুল ভক্তির বিকাশ সাধন করতে অভিলাষী হন, কিন্তু *শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ* এবং *নারদপঞ্চরাত্র* আদি শাস্ত্রসমূহের মধ্যে অভিব্যক্ত সাধারণ নিয়মাবলী লঙ্ঘন করেন, তা হলে তাঁর তথাকথিত ভগবদ্ভক্তি কেবলই সমাজকে বিভ্রান্ত করবে যাতে পারমার্থিক অগ্রগতি তথা বিকাশের শুভ কর্মপথের লক্ষ্য থেকে মানুষ বিপথগামী হতে থাকবে।" (*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ১/২/১০১) কৃষ্ণলীলার মধ্যে কোনও পুরুষের পক্ষে নারীর সাজসজ্জা (সখীভেক) গ্রহণ করার অভিলাষ থেকেই এই ধরনের ব্যাপার ঘটছে বলে বেশ বোঝা যাচ্ছে। এই ধরনের কাজ কৃষ্ণভক্তদের প্রবঞ্চনা এবং উপহাস করার মতোই অপরাধমূলক। সাম্ব শ্রীভগবানের আপনজন, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভণ্ড অনুগামীদের দ্বারা কলিযুগে ভবিষ্যতের দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির অগ্রদূতরূপে সাম্ব এই নীতিগর্ভ লীলার মাধ্যমে ভগবদ্ভক্তির যথার্থ পথে অবিচল থাকার সৌভাগ্য অর্জনে জীবকুলকে সহায়তা করে গেছেন।

বালকগুলি ঋষিদের বলেছিল, "হে ঋষিগণ, হে ব্রাহ্মণগণ, হে নারদমুনি ও অন্যান্য মহান ব্যক্তিগণ, আপনারা কী বলতে পারেন এই সন্তান সম্ভবা মহিলাটির গর্ভ থেকে ছেলে না মেয়ে জন্মাবে?" শুদ্ধ বৈষ্ণবমণ্ডলীকে এইভাবে সম্বোধন করার মাধ্যমে, তারা 'সখীভেক' অর্থাৎ নারীবেশে গোষ্ঠীগণের সখীরূপে পুরুষদের সাজিয়ে আধুনিক যুগে যে মিথ্যাচারী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে, তারই পূর্বাভাস দিয়েছিল। এই ধরনের অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ নিতান্তই শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত সমাজের পক্ষে অবমাননাসূচক এবং বিদ্রূপাত্মক।

চিন্ময় জগতের মাঝে শ্রীভগবানের প্রেম-মাধুর্য অর্থাৎ মধুর-রতির অপ্রাকৃত আস্বাদনে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ মানুষদের 'শুদ্ধ ভক্ত' রূপে মর্যাদা প্রদানের প্রচেষ্টা করে থাকে বহু ভণ্ড যোগী, কারণ তারা মনে করে যে, সংস্কারমুক্ত ভাবধারার স্তরে তারা বুঝি সর্বোত্তম ভক্তিপন্থা পরিবেশন করছে। যদিও তারা জানে যে, শ্রীভগবানের যে সব পার্ষদ মুক্তাত্মা, তাদের অনুকরণের কোন যোগ্যতাই সাধারণ জনগণের নেই, তা সত্ত্বেও অশ্রুবর্ষণ, বিগলিত হৃদয়াবেগ, এক শরীরে রোমাঞ্চ

সৃষ্টি ইত্যাদি লক্ষণগুলির মতো, আধ্যাত্মিক সিদ্ধি অর্জনের আলঙ্কারিক চিহ্নগুলি দিয়ে সাধারণ মানুষদের কৃত্রিম সাজে তারা সাজাতে থাকে। তারফলে, এই সমস্ত অপদার্থ যোগী সন্ন্যাসীরা জগতবাসীকে বিভ্রান্ত করবার মতোই একটি প্রক্রিয়া প্রবর্তন করে থাকে।

যেহেতু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপলব্ধি করেছিলেন যে, এই ধরনের অপদার্থ যোগী অর্থাৎ, কুযোগীদের সংঘটিত মহা দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা কলিযুগে প্রতিরোধ করা অসম্ভব, তাই তিনি তাদের জড়জাগতিক লক্ষ্যপূরণের অপ্রকৃতিস্থ বাসনার দ্বারা সংক্রমিত করে দিয়েছিলেন, যাতে সাধারণ মানুষেরা শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির পন্থা থেকে ঐ ধরনের ভণ্ড যোগীদের পার্থক্য অনায়াসে নিরূপণ করে নিতে পারে।

সাম্বকে নারীর পোশাকে সাজিয়েছিল যদুবংশের যে সব কুমার বালকেরা, ব্রাহ্মণকুল এবং বৈষ্ণবমণ্ডলীর প্রতি তাদের উপহাসের আচরণ, এবং তার পরিণামে যদুবংশের ধ্বংস হওয়া থেকে কৃত্রিম ভাবাবেশী 'সহজিয়া' সম্প্রদায়গুলির অপদার্থতা সুদৃঢ়ভাবেই প্রতিপন্ন হয়।

শ্রীল জীব গোস্বামী সুস্পষ্টভাবেই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, যদুবংশের কুমারেরা যেভাবে নম্রতা তথা ভব্যতার অভাব দেখিয়েছিল, সেটি স্বয়ং শ্রীভগবানেরই আয়োজিত ব্যবস্থা। অন্যভাবে বলতে গেলে, যদুবংশের সকলেই আদ্যোপান্তভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদবর্গ, এবং শ্রীভগবানেরই শিক্ষাপ্রদ লীলাবিস্তার সুগম করে তোলার উদ্দেশ্যেই তারা আপাতদৃষ্টিতে নীতিবিগর্হিত পন্থার আচরণ করেছিল।

শ্লোক ১৬

এবং প্রলব্ধা মুনয়স্তানূচুঃ কুপিতা নৃপ।
জনয়িষ্যতি বো মন্দা মুষলং কুলনাশনম্ ॥ ১৬ ॥

এবম্—এইভাবে; **প্রলব্ধা**—প্রতারণার মাধ্যমে; **মুনয়ঃ**—মুনিবর্গ; **তান্**—ঐ বালকদের; **ঊচুঃ**—তাঁরা বলেছিলেন; **কুপিতা**—রাগান্বিত হয়ে; **নৃপ**—হে পরীক্ষিৎ মহারাজ; **জনয়িষ্যতি**—ঐ নারী প্রসব করবে; **বঃ**—তোমাদের জন্য; **মন্দাঃ**—ওহে নির্বোধগণ; **মুষলম্**—লৌহদণ্ড; **কুলনাশনম্**—যেটি বংশ ধ্বংস করবে।

অনুবাদ

হে মহারাজ, এইভাবে ছলনার মাধ্যমে উপহাস-বাক্যে কুপিত হয়ে মুনিবর্গ বললেন, "ওরে নির্বোধেরা! এই রমণী তোমাদের জন্য একটি লোহার মুষল প্রসব করবে, আর সেটিই তোমাদের সম্পূর্ণ বংশটিকে ধ্বংস করে দেবে।"

তাৎপর্য

বদ্ধ জীবের যে চারটি দোষ আছে—ভুল করার প্রবণতা (*ভ্রম*), বিভ্রান্তির প্রবণতা (*প্রমাদ*), ত্রুটিপূর্ণ ইন্দ্রিয়াদি (*করণাপাটব*) এবং প্রবঞ্চনা করার প্রবণতা (*বিপ্রলিপ্সা*)—সেইগুলি শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। অবশ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিজ পরিবারবর্গ তথা যদুবংশের কুমার বালকদের ক্ষেত্রে মানবজাতির সেই সমস্ত বিপজ্জনক হীনতর প্রবৃত্তিগুলির অভিপ্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। তাই যাদব-বালকগুলি অভক্ত সম্প্রদায়ের অনুসারীদের কার্যকলাপেরই অনুকরণ করেছিল।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর তিরোভাবের ঠিক আগেই ইচ্ছা করেছিলেন যে, যদুবংশের কুমার বালকদের প্রতি মুনিঋষিবর্গ ক্রোধান্বিত হয়ে ওঠেন, যাতে শিক্ষালাভ হতে পারে যে, বৈষ্ণবদের নির্বোধ, অজ্ঞ কিংবা জড়জাগতিক ভাবাপন্ন বলে মনে করা চলে না এবং যাতে তাঁর নিজ পরিবারবর্গের মানুষদের বৃথা অহঙ্কার হ্রাস পেতে পারে।

কখনও-বা বিভ্রান্ত লোকেরা অভক্তের ভেক ধারণ করে এবং শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির যথার্থ ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার অবমাননা করতে থাকে, আর শ্রীভগবানের মঙ্গলবাণী প্রচারে নিবেদিত প্রাণ শুদ্ধ ভক্তদের হতশ্রদ্ধা করে। ঐসব নির্বোধ অভক্তেরা মনে করে যে, ভগবানের মহিমা প্রচারের যথার্থ উদ্যোগের নিন্দামন্দ বা ঘৃণা-ঈর্ষা করাই ভগবদ্ভক্তির অভিপ্রকাশ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সব প্রবৃত্তি তাদের নিজেদের এবং তাদের অনুগামী দুর্ভাগা মানুষদের জীবনেও সকল প্রকার বিঘ্নের কারণ হয়ে ওঠে।

শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির প্রচারকেরা অভক্তদের সর্বনাশা প্রচেষ্টার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে থাকেন, এবং ঠিক সেইভাবেই শ্রীনারদমুনি প্রমুখ ঋষিবর্গ, যাঁরা ছিলেন শ্রীভগবানের মহান ভক্তমণ্ডলী, তাঁরা যদুবংশের কুমার-বালকদের উদ্দেশ্য করে তাদের বিভ্রান্ত মূর্খ বিবেচনা করে বলেছিলেন, "এই সাধুটির ছদ্মবেশ তথা মিথ্যা গর্ভের মধ্যে একটি মুষল (মুগুর) জন্মলাভ করবে যেটি তোমাদের বংশ ধ্বংসের কারণ হয়ে উঠবে।"

বিশেষত ভারতবর্ষে, তবে এখন পাশ্চাত্য দেশগুলিতেও এক শ্রেণীর কলুষভাবাপন্ন ইন্দ্রিয়ভোগী রয়েছে, যারা নিজেদের গৌড়ীয় বৈষ্ণব বলে পরিচয় দিয়েও থাকে এবং প্রেম-ভক্তির চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনও করে। তারা সোচ্চারে বলে থাকে যে, তারা ভক্তিমার্গের সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থান করে আছে এবং তাই বৃন্দাবনধামে যে 'মাধুর্যলীলা' উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, সেই অতি অন্তরঙ্গ লীলা অনুশীলনেই তারা শুধুমাত্র অনুরাগী। কখনও-বা তারা গোপীদের মতোই বেশভূষা

ধারণ করে, প্রচলিত বিধিনিয়মাদি যথাযথভাবে প্রতিপালন না করেই, শ্রীকৃষ্ণের লীলা প্রসঙ্গে অনুপ্রবেশের ভণ্ড আচরণ করতে থাকে। প্রেমভক্তি অনুশীলনের ছলনায়, তারা কখনও-বা শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তদের কাছে গুরুতর অপরাধও করে থাকে। সাম্বের কল্পিত গর্ভ থেকে লোহার মুষল সম্পর্কিত এই কাহিনীর মাধ্যমে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ঐ ধরনের অভক্তির মারাত্মক কুফল সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করেন।

শ্লোক ১৭

তচ্ছ্রুত্বা তেঽতিসন্ত্রস্তা বিমুচ্য সহসোদরম্ ।
সাম্বস্য দদৃশুস্তস্মিন্ মুষলং খল্বয়ঃময়ম্ ॥ ১৭ ॥

তৎ—তা; **শ্রুত্বা**—শুনে; **তে**—তারা; **অতি-সন্ত্রস্তা**—খুব ভয় পেয়ে; **বিমুচ্য**—আচরণ উন্মোচন করে; **সহসা**—দ্রুত; **উদরম্**—উদর; **সাম্বস্য**—সাম্বের; **দদৃশুঃ**—তারা দেখতে পেল; **তস্মিন্**—তার মধ্যে; **মুষলম্**—মুষল; **খলু**—বাস্তবিকই; **অয়ঃ-ময়ম্**—লোহার তৈরি।

অনুবাদ

ঋষিবর্গের অভিশাপ শুনে, ভীতসন্ত্রস্ত বালকগুলি তাড়াতাড়ি সাম্বের উদরের আবরণ উন্মোচন করল, এবং বাস্তবিকই তারা সেইখানে একটি লোহার মুষল দেখতে পেল।

তাৎপর্য

শ্রীনারদমুনি প্রমুখ বৈষ্ণবগণের কথা শুনে, যদু-বালকেরা সাম্বের নিম্নোদরে আবৃত সাজ পোশাক উন্মুক্ত করল এবং তারা বৈষ্ণবজনের প্রতি যে অপরাধ করেছে, তার ফলস্বরূপ সেখানে বাস্তবিকই একটি মুষল পেল, যা দিয়ে তাদের বংশ ধ্বংস হয়ে যাবে। এই দৃষ্টান্ত থেকে প্রকাশ পায় যে, কলুষিত সমাজে কপটতার মুষল কোনও দিনই ভক্তসমাজে যেমন শান্তির পরিবেশ দেখা যায়, তেমন পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে পারবে না। বরং, ঐ ধরনের কপট আচরণের ফলে অভক্তদের সকল প্রকার অভক্তিমূলক ক্রিয়াকলাপ এবং অবিবেচনাপ্রসূত ভাবধারা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়েই যায়। যদুকুমারেরা তাদের বিশেষ বংশমর্যাদা বিনষ্ট হওয়ার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়েছিল আর তাই তারা নিশ্চয়ই মনে করেছিল যে, যতদিন তাদের নষ্টামি গোপন রাখতে পারবে, ততদিন অন্য কেউ বুঝি ঐ ধরনের কূটবুদ্ধিজাত প্রবঞ্চনা বুঝে উঠতে পারবে না। তা সত্ত্বেও, শ্রীভগবানের ভক্তমণ্ডলীর বিরুদ্ধে তাদের গুরুতর অপরাধের প্রতিফল থেকে তাদের পরিবারবর্গকে তারা রক্ষা করতে সক্ষম হয়নি।

শ্লোক ১৮

কিং কৃতং মন্দভাগ্যৈর্নঃ কিং বদিষ্যন্তি নো জনাঃ ।
ইতি বিহ্বলিতা গেহানাদায় মুষলং যযুঃ ॥ ১৮ ॥

কিম্—কি; কৃতং—করেছি; মন্দভাগ্যৈঃ—কী হতভাগ্য; নঃ—আমাদের; কিম্—কি; বদিষ্যন্তি—তারা বলবে; নঃ—আমাদের; জনাঃ—পরিবার-পরিজন; ইতি—এইভাবে বলে; বিহ্বলিতাঃ—বিব্রত হয়ে; গেহান্—তাদের বাড়িতে; আদায়—গ্রহণ করে; মুষলম্—মুষলটি; যযুঃ—তারা ফিরে গেল।

অনুবাদ

যদুবংশের কুমারগণ বলল, "আহা, আমরা কী করলাম? আমরা কী হতভাগ্য! আমাদের পরিবার-পরিজন আমাদের কী বলবে?" এইভাবে বলতে বলতে দারুণ বিচলিত হয়ে, তারা মুষলটিকে নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল।

শ্লোক ১৯

তচ্চোপনীয় সদসি পরিম্লানমুখশ্রিয়ঃ ।
রাজ্ঞ আবেদয়াঞ্চক্রুঃ সর্বযাদবসন্নিধৌ ॥ ১৯ ॥

তৎ—সেই মুষলটি; চ—এবং; উপনীয়—নিয়ে; সদসি—সভাসদদের মাঝে; পরিম্লান—সম্পূর্ণ ম্লান; মুখ—তাদের মুখ; শ্রিয়ঃ—রূপ; রাজ্ঞে—রাজাকে; আবেদয়াং চক্রুঃ—তারা নিবেদন করল; সর্ব-যাদব—সমস্ত যাদবদের; সন্নিধৌ—সন্নিধানে, উপস্থিতিতে।

অনুবাদ

সম্পূর্ণ ম্লানমুখে যদুবালকেরা মুষলটিকে রাজসভায় নিয়ে এসেছিল, এবং সমস্ত যাদবদের সামনে তারা রাজা উগ্রসেনকে বলল—কী ঘটনা ঘটেছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, '*রাজ্ঞে*' কথাটি রাজা উগ্রসেনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছিল, শ্রীকৃষ্ণের সম্বোধনে নয়। বালকগুলি তাদের লজ্জা এবং আশঙ্কায় পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সামনেই যায়নি।

শ্লোক ২০

শ্রুত্বামোঘং বিপ্রশাপং দৃষ্ট্বা চ মুষলং নৃপ ।
বিস্মিতা ভয়সন্ত্রস্তা বভূবুর্দ্বারকৌকসঃ ॥ ২০ ॥

শ্রুত্বা—শুনে; অমোঘম্—অব্যর্থ; বিপ্রশাপম্—ব্রহ্ম অভিশাপ; দৃষ্ট্বা—দেখে; চ—এবং; মুষলম্—মুগুরটি; নৃপ—হে রাজা; বিস্মিতাঃ—বিস্মিত; ভয়—ভীত; সম্ভ্রান্তা—বিচলিত; বভূবুঃ—তারা হল; দ্বারকা-ওকসঃ—দ্বারকাবাসীরা।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, দ্বারকাবাসীরা যখন অব্যর্থ ব্রহ্মশাপের কথা শুনল এবং মুষলটি দেখতে পেল, তখন তারা ভয়ে সন্ত্রস্ত এবং বিস্মিত হয়ে উঠল।

শ্লোক ২১

তচ্চূর্ণয়িত্বা মুষলং যদুরাজঃ স আহুকঃ ।
সমুদ্রসলিলে প্রাস্যল্লোহঞ্চাস্যাবশেষিতম্ ॥ ২১ ॥

তৎ—সেই; চূর্ণয়িত্বা—চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়ে; মুষলম্—মুষলটি; যদুরাজঃ—যদুরাজা; সঃ—তিনি; আহুকঃ—আহুক (উগ্রসেন); সমুদ্র—সাগর; সলিলে—জলে; প্রাস্যৎ—তিনি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন; লোহম্—লৌহের টুকরাগুলি; চ—এবং; অস্য—সেই মুষলটি; অবশেষিতম্—অবশিষ্টাংশগুলি।

অনুবাদ

যদুবংশের রাজা আহুক (উগ্রসেন) স্বয়ং সেই মুষলটিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে সমস্ত লৌহখণ্ডগুলি সমেত সমুদ্রের জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

তাৎপর্য

রাজা উগ্রসেন মনে করেছিলেন, "সাম্ব বা অন্য কারও পক্ষেই এই নিয়ে কোনও ভয় বা লজ্জা করার দরকার নেই," এবং তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণের সাথে কোনও প্রকার পরামর্শ না করেই মুষলটিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে জলে ফেলার মনস্থ করেন এবং সেই সঙ্গে একখণ্ড লোহাও ছিল—যা তিনি তেমন গ্রাহ্য করেননি।

শ্লোক ২২

কশ্চিন্মৎস্যোঽগ্রসীল্লোহং চূর্ণানি তরলৈস্ততঃ ।
উহ্যমানানি বেলায়াং লগ্নান্যাসন্ কিলৈরকাঃ ॥ ২২ ॥

কশ্চিৎ—কোনও একটি; মৎস্যঃ—মাছ; অগ্রসীৎ—গ্রাস করেছিল; লোহম্—লোহা; চূর্ণানি—চূর্ণগুলি; তরলৈঃ—ঢেউ; ততঃ—সেখান থেকে; উহ্যমানানি—নিয়ে আসা হয়; বেলায়াম্—সমুদ্রতীরে; লগ্নানি—আটকিয়ে থেকে; আসন্—সেগুলি হল; কিল—অবশেষে; এরকাঃ—নলখাগড়া কাঠি।

অনুবাদ

কোনও একটি মাছ তখন সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত লোহার খণ্ডটিকে গ্রাস করেছিল এবং লোহার চূর্ণগুলি সমুদ্র তরঙ্গে বিক্ষিপ্ত হয়ে তীরে এসে এরকা নামে এক প্রকার নলখাগড়া কাঠির ঝোপ সৃষ্টি করল।

শ্লোক ২৩

মৎস্যো গৃহীতো মৎস্যঘ্নৈর্জালেনান্যৈঃ সহার্ণবে ।
তস্যোদরগতং লোহং স শল্যে লুব্ধকোঽকরোৎ ॥ ২৩ ॥

মৎস্যঃ—মাছটি; গৃহীতঃ—ধরা পড়ে; মৎস্যঘ্নৈঃ—মৎস্য জীবীদের; জালেন—জালের দ্বারা; অন্যৈঃ সহ—অন্যান্য মাছের সঙ্গে; অর্ণবে—সমুদ্রের মধ্যে; তস্য—সেই মাছটির; উদর-গতম্—পেটের মধ্যে অবস্থিত; লোহম্—লোহার টুকরো; সঃ—সে (জরা); শল্যে—তার বাণের অগ্রভাগে; লুব্ধকঃ—ব্যাধ; অকরোৎ—বসিয়ে নিয়েছিল।

অনুবাদ

মৎস্যজীবীদের জালে অন্যান্য মাছের সঙ্গে সমুদ্রের মধ্যে সেই মাছটি ধরা পড়েছিল। মাছটির পেটের মধ্যে সে লোহার খণ্ডটি ছিল, সেটি নিয়ে জরা নামে একজন ব্যাধ তার বাণের অগ্রভাগে তীরের ফলার মতো আটকিয়ে নিয়ে ছিল।

শ্লোক ২৪

ভগবান জ্ঞাতসর্বার্থঃ ঈশ্বরোঽপি তদন্যথা ।
কর্তুং নৈচ্ছদ্বিপ্রশাপং কালরূপ্যন্বমোদত ॥ ২৪ ॥

ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; জ্ঞাত—জানতে পেরে; সর্বার্থঃ—সব কিছু বুঝতে পেরে; ঈশ্বরঃ—সর্ববিষয়ে প্রতিকারে সক্ষম; অপি—যদিও; তৎ-অন্যথা—অন্যভাবে; কর্তুম্—করতে; ন ঐচ্ছৎ—তিনি ইচ্ছা করলেন না; বিপ্রশাপম্—ব্রহ্ম অভিশাপ; কালরূপী—তাঁর মহাকালরূপী অভিপ্রকাশে; অন্বমোদত—সানন্দে অনুমোদন করেছিলেন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান এই সমস্ত ঘটনাবলীর বৃত্তান্ত এবং তাৎপর্য সম্পূর্ণভাবে অবগত হওয়া সত্ত্বেও, তিনি ব্রহ্মশাপ নিবারণ করতে সমর্থ হলেও, কিছু করতে চাইলেন না। বরং, শ্রীভগবান তাঁর মহাকালরূপী অভিপ্রকাশের মাধ্যমে সানন্দে ঐ সমস্ত ঘটনাবলী অনুমোদন করেছিলেন।

তাৎপর্য

সাধারণ লোকে বিস্মিত তথা বিভ্রান্ত হতে পারে যে, শ্রীভগবান তাঁর নিজ বংশধরদের প্রতি অভিশাপ এবং তার ধ্বংসপ্রক্রিয়ায় সানন্দে অনুমোদন জ্ঞাপন করেছিলেন। এখানে *অন্বমোদত* কথাটির প্রয়োগ করে বোঝানো হয়েছে—কোনও বিষয়ে প্রসন্নতা সহকারে অনুমোদন করা হল। আরও উল্লেখ করা হয়েছে—*কালরূপী*—শ্রীকৃষ্ণ মহাকাল রূপে ব্রাহ্মণদের অভিশাপে তাঁর সানন্দ সম্মতি জ্ঞাপন করেছিলেন।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ মন্তব্য করেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ব্রহ্মশাপ বলবৎ রাখার মনস্থ করেছিলেন, যাতে যথার্থ ধর্মনীতি সুরক্ষিত থাকে এবং কার্ষ্ণ বংশজাত কপট সদস্যকুলের অশোভন অপরাধ প্রবৃত্তি বিধ্বংস হতে পারে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় স্পষ্টই ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, জড়জাগতিক প্রকৃতির নিয়মাধীন বদ্ধজীবেরা যে সমস্ত দুঃখকষ্টে জর্জরিত হচ্ছে, তাদের জন্য প্রামাণ্য ধর্মনীতির সংস্থাপনা করে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্যমুক্ত সেবকরূপে তাদের যথার্থ সত্তায় পুনরধিষ্ঠিত করাই এই জড়জগতে শ্রীভগবানের আবির্ভাবের মূল উদ্দেশ্য।

জড়া প্রকৃতির উপর প্রাধান্য তথা কর্তৃত্ব করবার বাসনাতেই জীবগণ এই জড়জগতে আসে, যদিও বাস্তবে জীবমাত্রই কোনও কিছুরই কর্তা বা প্রভু নয়, বরং নিত্যদাস মাত্র। সমগ্র জগৎ আত্মসাৎ করে উপভোগের এই কলুষিত প্রবণতার ফলেই, জীবগণ পারমার্থিক জীবনধারার নীতিলঙ্ঘন করতেও অপপ্রয়াস চালায় যাতে নিত্যকালের ধর্মনীতিগুলি তার নিজের জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির অনুকূল হয়ে ওঠে।

অবশ্য, পরমেশ্বর ভগবানের বিধিনিয়মগুলি মান্য করে তাঁকে সন্তুষ্ট করাই যথার্থ ধর্ম। আর তাই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর চরণকমলে যথার্থ প্রেমভক্তি নিবেদনের সেবাকার্য পুনরুদ্ধার তথা পুনরুজ্জীবিত করে তোলার উদ্দেশ্যেই যুগে যুগে স্বয়ং আগমন করে থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে সুস্পষ্টভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে তাঁর লীলাবিস্তারের বিপুলাংশই সমাধা করে ফেলেছিলেন এবং তাঁর অন্তর্ধানের জন্য চূড়ান্ত ব্যবস্থাদির এখন আয়োজন করছিলেন। তাই, তিনি বর্তমান যুগের জীবকুলের জন্য এক সুস্পষ্ট শিক্ষণীয় বিষয় রেখে যেতে অভিলাষ করেছিলেন যে, ধার্মিক ব্যক্তিরূপে পরিচিত যে কোনও মানুষ, শ্রীভগবানের আপন বংশে জন্মলাভের সৌভাগ্য অর্জন করলেও, শ্রীনারদ মুনি প্রমুখ শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তদের প্রাপ্য যথাযোগ্য মান-সম্ভ্রম কেউ লঙ্ঘন করতে পারে না।

পারমার্থিক বিকাশের উদ্দেশ্যে শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তের সেবাপরায়ণতার নীতি এমনই অপরিহার্য আচরণ যে, শ্রীভগবান কলিযুগের বদ্ধ জীবদের মনে শুধুমাত্র এই বিষয়টির গুরুত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যেই তাঁর নিজেরই সমগ্র বংশ ধ্বংসের কারণ ঘটিয়ে অচিন্তনীয় লীলাবৈচিত্র্য প্রদর্শন করে গিয়েছেন।

পরম পুরুষোত্তম ভগবানের অন্তর্ধানের পরে যে মহা দুর্যোগ আসবে, *শ্রীমদ্ভাগবতে* তার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলীর সকলে যাঁকে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে স্বীকার করেছেন, সেই মহাবদান্যাবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর তিরোধানের পরেও ঠিক এমনই দুর্যোগ সৃষ্টি হয়েছিল। শ্রীভগবানের অন্তর্ধানের পরে মানব সমাজে প্রবঞ্চনাময় যে অপধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তা দূর করার উপায়স্বরূপ *শ্রীমদ্ভাগবত* বিবিধ উপদেশাবলীর মাধ্যমে পথ নির্দেশ করেছে।

বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মীদের নিরীশ্বরবাদী মতাবলম্বনের যে বিপুল প্রভাব অভক্তদের গুরু-শিষ্য পরম্পরাক্রমে অপসম্প্রদায়গুলির সর্বপ্রকার অলীক ভাবধারার মাধ্যমে দক্ষিণ ভারতে একদা বিস্তারলাভ করেছিল, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর মহাবদান্য লীলাবিস্তারের মাধ্যমে তা সবই দূরীভূত করেছিলেন। এইভাবে তিনি সমগ্র ভারতবর্ষকেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রেমভক্তি অনুশীলনের দিকে উন্মুখ করে তুলেছিলেন, যাতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর অনুগামীদের ব্যাপক প্রচারকার্যের ফলে পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রেমভক্তি অনুশীলন ছাড়া পৃথিবীতে অন্য কোনও বিষয়ই আলোচনার জন্য অবশিষ্ট থাকেনি। ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী তাঁর রচিত *স্ত্রীপুত্রাদিকথাং জন্তুর্বিষয়িণঃ* শ্লোকে এই বিষয়ে বিশদ অভিব্যক্তি উপস্থাপন করেছেন:

শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর তাঁর *কৃষ্ণভজনামৃত* গ্রন্থে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে *গৌরাঙ্গনাগরীবাদী, সখীভেকবাদী,* এবং অন্যান্য এগারো প্রকার অপসম্প্রদায়গুলির ধারায় যারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুসারী বলে দাবী করে থাকে, তাদের ছলনাময়ী ধার্মিক-সজ্জার অশুভ বাক্যগুলি শোধন করে শুদ্ধ ভজনের কথা জানিয়েছেন। এই সমস্ত ভণ্ড লোকগুলি ধর্মকথার নামে প্রচ্ছন্নভাবে কপটতা বিস্তার করে থাকে এবং তাদের ছলনাগুলি কৃষ্ণকথা তথা শ্রীভগবানের শুদ্ধ ভজনরূপে প্রচারিত করে।

শ্রীকৃষ্ণ যেমনভাবে তাঁর নিজ পরিবারবর্গের মধ্যে প্রচণ্ড কলহ-বিবাদের সূচনা করে স্বীয় বংশ ধ্বংসের আয়োজন করেছিলেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও তেমনভাবেই ঠিক তাঁর অন্তর্ধানের পরে বিবিধ প্রকার মায়াবাদ এবং কর্মবাদের দর্শনতত্ত্বে সারা পৃথিবীকে নিমজ্জিত করে যাওয়ার আয়োজন করেছিলেন।

যে এগারোটি অপসম্প্রদায় গুরু-শিষ্যপরম্পরা ক্রমে প্রচলিত ছিল এবং অন্য আরও যে সমস্ত অপসম্প্রদায় ভবিষ্যতে উদ্ভূত হয়ে নিজেদেরকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দ রূপে পরিচয় দিতে পারে কিংবা মহাপ্রভুরই বংশধর বলে ছলনা করতে পারে, তাদের বিনাশ সাধনের উদ্দেশ্যেই তিনি এই কাজ করেছিলেন। সেই সঙ্গে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর আপনজনদের এই সমস্ত ভণ্ডদের অভক্তির কবল থেকে দূরে রাখার আয়োজন করেছিলেন।

ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিস্তারের মাধ্যমে প্রকটিত হয়েছিল যে সকল লীলাবৈচিত্র্য, সেইগুলির রহস্যঘন তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেন। কোনও প্রকার জাগতিক পদ্ধতির মাধ্যমে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের অপ্রাকৃত শরীরের কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। এই অধ্যায়টির সেটাই সারমর্ম।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'যদুবংশের প্রতি অভিশাপ' নামক প্রথম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।